পাক্ষিক

আহ্‌মদী

Fortnightly AHMADI

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য
জগতে আজ কুরআন
ব্যতিরেকে আর কোন
ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য বর্তমানে
মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল ও
শাফায়াতকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত
প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে
চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও
তাঁহার উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪০শ বর্ষ।। ১লা সংখ্যা
৫ই রমজান ১৪০৬ হিঃ।। ৩১শে বৈশাখ ১৩৯৩ বাংলা।। ১৫ই মে ১৯৮৬ইং
বার্ষিক চাঁদা।। বাংলাদেশ ও ভারত ৩০·০০ টাকা।। অন্যান্য দেশ ৫ পাউন্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী'

৪০শ বর্ষ:
১৫ই মে ১৯৮৬
১ম সংখ্যা:

বিষয়	লেখক	পৃ:
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা হুদ (১২শ পারা, ১০ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'রোযার ফযিলত ও নিয়মাবলী'	অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ	৩
* অমৃত বাণী : 'রোযা-তত্ত্ব'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ	৫
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : জনাব নজির আহমদ ভুঁইয়া	৬
* জুম্‌য়ার খোৎবা (সারসংক্ষেপ) :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৫
* সুলতানুল কলম হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর গ্রন্থ-পরিচিতি—৮ :	জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	২২
* একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা—১২ :	জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২৬
* সংবাদ :	সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৩০
* সিলসিলার বুজুর্গানদের স্মরণে—৩ :	চৌধুরী আবদুল মতিন	৩৩
* বিলাল যুগে যুগে (কবিতা) :	মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান	৩৪
* আহমদীদের বিয়ে-শাদী (কবিতা) :	চৌধুরী আবদুল মতিন	৩৫
* হে মযলুম বন্ধুগণ ! (কবিতা) :	ইকবাল (মুন্সিগঞ্জ)	

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) লণ্ডনে আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। হুজুর আকদাসের সুস্বাস্থ্য, সালামতি ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং সকল দ্বীনি উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে পূর্ণ সাফল্য লাভের জন্য বন্ধুগণ দোওয়া জারি রাখিবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৪০শ বর্ষ : ১ম সংখ্যা

১৫ই মে ১৯৮৬ইং : ১৫ই হিজরত ১৩৬৫ হিঃ শামসী : ৩১শে বৈশাখ ১৩৯৩ বাংলা :

তরজমাতুল কোরআন

সুরা হুদ

[ইহা মক্কী সুরা, ইহার বিসমিল্লাহ সহ ১২৪ আয়াত এবং ১০ রুকু আছে]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১২শ পারা **১০ম রুকু**

১১১। এবং নিশ্চয় আমরা (বিভেদ দূর করিবার জন্য) মূসাকেও কিতাব দিয়াছিলাম, কিন্তু (কিছুকাল পরে) উহাতেও মতভেদ সৃষ্টি করা হইয়াছিল ; এবং যদি সেই (রহমতের ওয়াদার) কথা, যাহা তোমার রাব্বের তরফ হইতে পূর্বে নাযেল করা হইয়াছে, প্রতিবন্ধক না হইত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কবেই ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইত, এবং এখন তাহারা ইহার (অর্থাৎ কুরআনের) সম্বন্ধেও এক উদ্বেগজনক সন্দেহে পড়িয়া আছে।

১১২। এবং তোমার রাব্ব নিশ্চয় তাহাদের সকলকে তাহাদের কাজের ফল পূর্ণরূপে দিবেন ; তাহারা যাহাকিছু করিতেছে সেই বিষয়ে তিনি পূর্ণ ওয়াকেফহাল।

১১৩। সুতরাং (হে রসুল !) তুমি এবং ঐ সকল লোক যাহারা তোমার সঙ্গে (আমার দিকে) রুজু করিয়াছে, যেভাবে তোমাকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে সেইভাবে সোজা পথে কায়েম থাক, এবং (হে মোমেনগণ !) তোমরা সীমা লংঘন করিওনা ; তোমরা যাহাকিছু করিতেছ তাহা তিনি দেখিতেছেন।

১১৪। সুতরাং তোমরা ঐ সকল লোকের প্রতি ঝুঁকিও না যাহারা যুলুম (এর পন্থা অবলম্বন) করিয়াছে, নচেৎ তোমাদিগকেও (জাহান্নামের) আগুন স্পর্শ করিবে, তখন আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু (ও সাহায্যকারী) হইবে না এবং তোমাদিগকে (কোন দিক হইতেই) সাহায্য করা হইবে না।

১১৫। এবং (হে মোমেন !) তুমি দিবসের দুই প্রান্তে এবং রাত্রির বিভিন্ন অংশে নামায কায়েম কর ; নিশ্চয় উত্তম আমলসমূহ মন্দ আমল সমূহকে দূর করিয়া দেয় ; ইহা (নসিহত) স্মরণকারীদের জন্য এক মহা নসিহত।

১১৬। এবং ধৈর্য অবলম্বন কর, কারণ আল্লাহ কখনও নেককারগণের পুরস্কারকে বিনষ্ট করেন না।

১১৭। তবে কেন ঐ সকল কওমের মধ্যে যাহারা তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে. এমন সব বুদ্ধিমান লোক হয় নাই যাহারা দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করা হইতে (লোকদিগকে) সংযত করিত, তাহাদের মধ্যে কেবল কয়েকজন ব্যতিরেকে যাহাদিগকে আমরা (তাহাদের নেক আমলের জন্য) নাজাত দিয়াছিলাম? এবং (বাকিলোক) যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহারা উহাতে (অর্থাৎ ধনসম্পদের ভোগ-বিলাসে) মশগুল হইয়া গেল, যাহাতে তাহাদিগকে সচ্ছলতা দেওয়া হইয়াছিল, এবং তাহারা অপরাধী হইয়া গেল।

১১৯। যদি তোমার রাব্ব তাঁহার ইচ্ছাকে বলবৎ করিতেন, তাহা হইলে তিনি সকল লোককে একই উম্মতভুক্ত করিয়াদিতেন, কিন্তু, (যেহেতু তিনি এইরূপ করেন নাই এবং তাহাদিগকে তাহাদের বিবেকের উপর স্বাধীন করিয়া ছাড়িয়াদিয়াছেন এই জন্য) তাহারা চিরকাল মতভেদ করিতে থাকিবে।

১২০। ঐ সকল লোক ব্যতিরেকে যাহাদের প্রতি তোমার রাব্ব রহমত করিয়াছেন, এবং ইহার (অর্থাৎ রহমতের অধিকারী বানাইবার) জন্যই তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু, তোমার রাব্বের এই বাক্য পূর্ণ হইবে যে, আমি জাহান্নামকে নিশ্চয় ঐ সকল জিন্ন এবং ইনসান দ্বারা ভরিয়া দিব (যাহারা মতভেদের কারণ হয়)।

১২১। এবং আমরা তোমার নিকট রসুলগণের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদসমূহ বর্ণনা করিতেছি যেন উহা দ্বারা আমরা তোমার হৃদয় মযবুত করিয়া দিই; এবং তোমার নিকট ইহাতে (অর্থাৎ এই সুরাতে) হক্ব, নসিহত এবং মোমেনদের জন্য এক স্মারক আসিল।

১২২। এবং তুমি ঐসকল লোককে, যাহারা ঈমান আনে নাই, বল, তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী আমল কর, আমরাও আমাদের (সামর্থ অনুযায়ী) আমল করিব।

১২৩। এবং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষা করিতেছি।

১২৪। এবং আসমানসমূহের ও যমীর অদৃশ্য এ বিষয় একমাত্র আল্লাহর, এবং (পরিনামে) তাঁহারই দিকে সকল বিষয় ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে; অতএব তুমি তাঁহার এবাদত কর এবং তাঁহার উপর ভরসা কর, এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ উহার সম্বন্ধে তোমার রাব্ব গাফেল নহেন।

(সুরা হুদ সমাপ্ত)

(ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

"তোমরা যদি চাহ যে স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহতায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া আর সম্ভব নয়।"

(কিশতিয়ে-নূহ)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

হাদিস শরীফ

রোযার ফজিলত ও নিয়মাবলী

রমজানের রোযা সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ

১। "আদম সন্তানের প্রত্যেক পুণ্যকার্য্যের পুরস্কার উহার দশ হইতে সত্তর গুণ পর্যন্ত হইবে, আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, রোযা ব্যতিরেকে। কারণ উহা আমার জন্য এবং আমি স্বয়ং উহার পুরস্কার। সে আমার জন্য রিপু দমন করে এবং আহার পরিহার করে। রোজাদারের দুইটি আনন্দ। একটি হইল রোযার এফতার করার সময় এবং অপরটি হইল প্রভুর সহিত মিলিত হইবার সময়। নিশ্চয় রোজাদারের মুখের (যিকরে ইলাহি জনিত) সৌরভ মৃগনাভীর সুগন্ধি অপেক্ষা অধিক প্রিয়। রোযা ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমাদের কেহ রোযা রাখ, মন্দ বাক্য উচ্চারণ করিবে না অথবা চেঁচামেচী করিবে না। যদি কেহ তোমাদের গালি দেয় বা মারামারি করিতে আসে তাহা হইলে বলিও আমি রোযাদার।

(মুসলিম ও বুখারী)

২। "যখন রমজান আসিত, আল্লাহর রসুল (সাঃ) সকল কৃতদাসকে মুক্ত করিতেন এবং সকল সায়েলকে (আবেদনকারী, ভিক্ষুককে) দান করিতেন।" (বাইহাকী)

৩। "আল্লাহর রসুল মানব কুলের মধ্যে সেরা দানশীল ছিলেন এবং রমযানে তাহার দান কার্য চরমে পৌঁছিত।" (মুসলিম ও বুখারী)

(৪) "আল্লাহর রসুল (সাঃ) রোযা অবস্থায় অগণিত বার দাঁত মাজিতেন।"

৫। "রোযাদার গড়গড়া করিয়া মুখ হইতে পানি ফেলিয়া দিবার পর তাহার মুখে যে পানি থাকিয়া যায়, মুখের লালার সহিত উহা গিলিলে উহাতে কোন ক্ষতি নাই। তবে কফ গিলিবে না। যদি কেহ কফ সংযুক্ত লালা গিলে, আমি (আল্লাহ রসুল—সাঃ) বলি না যে, তাহার রোযা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু ইহা করিতে নিষেধ করা যাইতেছে।" (বুখারী)

৬"রোযা অবস্থায় যে ভুলে পানাহার করে সে যেন রোযাকে পূর্ণ করে। অর্থাৎ রোযা না ভাঙ্গে) কারণ আল্লাহ তাহাকে পানাহার করাইয়াছেন" (বোখারী, মুসলেম)

(৭) "রোযা অবস্থায় কেহ বমি করিলে উহার জন্য কাযা করিতে হইবে না এবং ইচ্ছা করিয়া বমি করিলে কাযা করিতে হইবে।" (তিরমিযি ইবনে মাজা, আবু দাউদ)

(৮) "এক ব্যক্তি আল্লাহর রসুল (সাঃ)-কে বলিল আমার চক্ষে দোষ আছে।

আমি কি সুরমা ব্যবহার করিতে পারি ? তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ।" (তিরমিযি)।

(৯) এক সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন : আমি নিশ্চয় দেখিয়াছি (মক্কা মদিনার মধ্যবর্তী আরজ (নামক) স্থানে আল্লাহর রসুল (সা:) পিপাসা ও উত্তাপে (কাতর হইয়া) তাঁহার মাথায় পানি ঢালিতে ছিলেন। (মালেক, আবু দাউদ)।

(১০) "তিনটি বিষয়ে রোযা ভাঙ্গে না—রক্তক্ষরণ, বমি, স্বপ্ন-দোষে। (তিরমিযি)।

(১১) আয়েশা (রা:) বলিয়াছেন যে, আল্লাহর রাসুল (সা:) রোযা অবস্থায় তাঁহাকে চুম্বন দিতেন এবং আলিঙ্গণ করিতেন তবে তিনি তাঁহার কাম-রিপুর উপর তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংযম-শক্তির অধিকারী ছিলেন। (মোসলেম, বুখারী)

(১২) আবু হোরাইরা (রা:) বলিয়াছেন : এক ব্যাক্তি রসুল (সা:) কে জিজ্ঞাসা করিল রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে আলিঙ্গন করা সম্বন্ধে। তিনি তাহাকে অনুমতি দিলেন। আর এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে একই আবেদন জানাইল। তিনি তাহাকে নিষেধ করিলেন।

যাহাকে তিনি অনুমতি দিয়াছিলেন, সে বৃদ্ধ ছিল এবং যাহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন, সে যুবক ছিল। (আবু দাউদ)

সংকলন ও অনুবাদ : **মৌলবী মোহাম্মাদ**

(অমৃত বাণীর অবশিষ্টাংশ—৫ম পাতার পর)

চাহিলে সারা জীবন বসিয়া নামাজ পড়িতে পারে এবং রমজানের রোযা একেবারেই না রাখিতে পারে। কিন্তু খোদা তাহার এরাদা এবং নিয়তকে জানেন। যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা রাখে, খোদা জানেন যে তাহার অন্তরে দরদ আছে এবং খোদা তাহাকে (প্রাপ্য) সাওয়াবের অতিরিক্ত দিয়া থাকেন। কারণ অন্তরের বেদনা এক সম্মানযোগ্য বিষয়। বাহানাকারী মানুষ ব্যাখ্যার উপর ভরসা করে, কিন্তু খোদার নিকট ব্যাখ্যার কোন মূল্য নাই। যখন আমি ছয় মাস রোযা রাখিয়াছিলাম তখন একবার একদল নবী (কাশফে) আমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং তাহারা বলিয়াছিলেন, 'তুমি কেন নিজেকে এরূপ কষ্টে ফেলিয়াছ ?' ইহা হইতে বাহির হও। এইভাবে মানুষ যখন নিজেকে খোদার জন্য কষ্টে ফেলে, তখন তিনি স্বয়ং মা-বাপের ন্যায় রহম করিয়া তাহাকে বলেন, "তুমি কেন কষ্টে পড়িয়া আছ ?"

বদর, ১২ই ডিসেম্ব, ১৯০২ইং

অনুবাদ : মোহতারম মৌ: **মোহাম্মদ**

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

রোযা-তত্ত্ব

"যদি মানুষ নিষ্ঠা ও পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত খোদা-তায়ালার নিকট নিবেদন জানায় যে এই (রমজানের) মাসে আমায় বঞ্চিত রাখিও না, তাহা হইলে খোদা তাহাকে বঞ্চিত করেন না এবং এইরূপ অবস্থায় যদি কেহ রমজান মাসে পীড়িত হয়, তাহা হইলে এই পীড়া তাহার জন্য রহমত হইয়া থাকে, কারণ প্রত্যেক আমলের ভিত্তি হইল নিয়ত। মোমেনের কর্তব্য, যেন সে নিজেকে খোদাতায়ালার পথে সাহসী সাব্যস্ত করে। যে ব্যক্তি রোযা হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু তাহার অন্তরে এই নিয়ত মর্মবেদনার সহিত বিরাজমান থাকে যে, হায় আমি যদি সুস্থ থাকিতাম এবং এজন্য তাহার অন্তর কাঁদে, তাহা হইলে ফেরেশতারা তাহার জন্য রোযা রাখিবে। তবে শর্ত এই যে সে যদি বাহানা না করে, তাহা হইলে খোদাতায়ালা তাহাকে সওয়াব হইতে বঞ্চিত করিবেন না। ইহা এক সুক্ষ্ম বিষয় যে (নিজের নফসের শিথিলতার জন্য) যদি কোন ব্যক্তির নিকট রোযা বোঝা স্বরূপ হয় এবং সে মনে করে যে আমি পীড়িত এবং আমার স্বাস্থ্য এমন যে এক ওয়াক্ত খাবার না খাইলে অমুক অমুক উপসর্গ দেখা দিবে এবং নানারূপ কষ্ট হইবে, তাহা হইলে এরূপ ব্যক্তি যে খোদা-তায়ালার নেয়ামতকে নিজের উপর বোঝা মনে করে, কেমন করিয়া সে ঐ সওয়াবের যোগ্য হইবে? হাঁ, ঐ ব্যক্তি যাহার অন্তর ইহাতে আনন্দ অনুভব করে যে রমজান আসিয়া গিয়াছে, আমি ইহার জন্য অপেক্ষমান ছিলাম যে রমজান আসুক এবং আমি রোযা রাখিব কিন্তু সে যদি অসুখের জন্য রোযা রাখিতে না পারে তাহা হইলে সে আকাশে রোযা হইতে বঞ্চিত নহে। এই দুনিয়ার অনেকে বাহানা অন্বেষী, এবং মনে করে যে, আমরা যেইভাবে দুনিয়ার মানুষকে ধোকা দিই সেইভাবে খোদাকেও ধোকা দিব। বাহানা-অন্বেষী নিজের পক্ষ হইতে নিজেই মসলা বানায় এবং কষ্ট কল্পনা শামিল করিয়া ওজরগুলিকে সহী সাব্যস্ত করে। কিন্তু খোদার নিকট সে সব সহী নহে। বাহানার দরজা বড়ই প্রশস্ত। মানুষ

(অবশিষ্টাংশ ৪-এরপাতায় দেখুন)

জুম্‌য়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১৩ই ডিসেম্বর ১৯৮৫ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে প্রদত্ত]

তাশাহুদ, তায়াউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস (আইঃ) সুরা নেসার ১৪৩ ও ১৪৪ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন।

ان المنفقين يخدعون الله وهو
خادعهم ج واذا قاموا الى الصلوة
قاموا كسالى يراءون الناس
ولا يذكرون الله الا قليلا ○ مذبذبين بين
ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ○

অর্থঃ "মোনাফেকেরা নিশ্চয়ই আল্লাহকে ধোকা দিতে চাহে এবং তিনি তাহাদিগকে তাহাদের ধোকার শাস্তি প্রদান করিবেন। এবং যখন তাহারা নামাজের জন্য দাঁড়ায় তখন তাহারা শৈথিল্যের সহিত দাঁড়ায়। তাহারা লোকদিগকে প্রদর্শন করে এবং আল্লাহকে কমই স্মরণ করে। তাদের অবস্থা ইয়াদে (ইলাহী ও আলস্যের) মধ্যবর্ত্তী স্থানে থাকে। না তাহারা এই সকল (মোমেনদের) সাথে রহিয়াছে এবং না তাহারা ঐ সকল (কাফেরদের) সাথে রহিয়াছে আল্লাহ যাহাদিগকে ধ্বংস করেন, তুমি তাহাদের জন্য কখনো কোন (নাজাতের) পথ পাইবে না" (অনুবাদক)।

অতঃপর হুজুর আকদাস আইঃ বলেন :

সুরা নেসার ১৪৩ ১৪৪ নম্বরের যে দুইটি আয়াত আমি তেলাওয়াত করিয়াছি, উহাদের মধ্যে কোন কোন এইরূপ নামাজের বর্ণনা রহিয়াছে, যাহা খোদার দরবারে কবুল হয় না এবং ঐগুলি রদ করিয়া দেওয়া হয়। অতএব কোরআন করীম যখন কবুলিয়ত প্রাপ্ত নামাজ সম্বন্ধে সবিস্তারেউল্লেখ করে এবং উহাদের বৈশিষ্ট্যগুলিও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে, তখন রদকৃত নামাজের অবস্থাও খুবই সুস্পষ্টভাবে এবং সংশয়াতীতভাবে বড়ই সবিস্তারে বর্ণনা করে। এই নামাজগুলির মধ্যে ঐগুলিকে রদ করিয়া দেওয়া হয়, যেগুলি ফায়দার পরিবর্ত্তে লোকসান পেঁছায়, যেগুলি সম্বন্ধে এতটুকু পর্যন্ত বলা হইয়াছে যে ويل للمصلين

ধ্বংস ঐ সকল লোকদের জন্য যাহারা এরূপ নামাজ পড়ে, অর্থাৎ নামাজ রহমতের পরিবর্তে নামাজীদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করে। এই সকল নামাজের বিস্তারিত বর্ণনা যেখানেই পাওয়া যায় সেখানেই দুইটি শর্ত বড়ই সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমি আপনাদের সম্মুখে যে আয়াত তেলাওয়াত করিয়াছি, উহাতে খোদাতায়ালা বলেন إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ মোনাফেকেরা আল্লাহকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খোদার তকদীর তাহাদিগকে ধোকা দিয়া থাকে এবং যাহার মাধ্যমে তাহারা খোদাকে ধোকা দিতে চাহে, উক্ত মাধ্যম উল্টা তাহাদের উপর পতিত হয়। وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى এই লোকদের একটি নিশানী এই হইয়া থাকে যে, যখনই তাহারা নামাজের জন্য দাঁড়ায় তখন তাহারা আলস্য ও শৈথিল্যের সহিত দাঁড়ায়। তাহাদের মধ্যে দীনতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদের মধ্যে উৎসাহ, আকাঙ্খা ও উদ্দীপনা দেখিতে পাওয়া যায় না। يُرَآءُوْنَ النَّاسَ তাহারা লোকদিগকে প্রদর্শন করে এবং রীয়াকারীর (লোক দেখানোর) মনোভাব লইয়া নামাজ আদায় করে। وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا তাহাদের নামাজ কার্যতঃ 'ইয়াদে ইলাহী' (খোদার স্মরণ) হইতে খালি থাকে। مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ তাহারা দুইটি বিষয়ের মধ্যে সংশয়ে দোদুল্যমান অবস্থায় পড়িয়া থাকে, অর্থাৎ তাহারা জাগতিক স্বার্থ ও খোদার মধ্যে দোদুল্যমান থাকে। لَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ না তাহারা এই দিকে থাকে, না ঐদিকে থাকে (প্রবাদে যেমন কিনা বলা হয় "না ঘরকা, না ঘাটকা"—অনুবাদক)। না তাহারা দুনিয়ার হইয়া থাকে, না খোদার হইয়া থাকে এবং যাহাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন, তুমি তাহার জন্য 'হক' (সত্য ধর্ম) পাওয়ার কোন পথ পাইবে না।

এই আয়াতগুলিতে নামাজ সম্বন্ধে বড় কঠোর সাবধানবানী দেখিতে পাওয়া যায়। যখন কোন কোন মোমেন কোরআন করীমের এই আয়াতগুলি পড়িতে থাকে তখন তাহারা প্রকম্পিত হইয়া যায় এবং মানুষ এই কথা ভাবিতে বাধ্য হইয়া যায় যে, অধিকাংশ লোকের নামাজে 'কুছালা'র (শৈথিলা, আলস্য, অমনোযোগ ইত্যাদি) অবস্থাতো খুবই বিপুলভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। 'রীয়াকারী' থাকুক বা না থাকুক, ধ্বংসের যে কীটের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে 'কুছালা'র কীট খুব বিপুল পরিমাণে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ তাহারা এরূপ অবস্থায় নামাজ পড়ে যে, তাহারা আলস্য, শৈথিলা ও অমনোযোগের শিকার হইয়া যায়। তাহা হইলে এইরূপ নামাজ কি মানুষের ফায়দার পরিবর্তে লোকসান পৌঁছাইবে? তাহা হইলে ইহা কি উত্তম নহে যে, এইরূপ নামাজ পড়ার চাইতে নামাজ ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত এবং এই বিপদের পথ না মাড়ানোই উচিত, যে পথে নামাজ নিজেই মানুষের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করে। এই ধারণা ঠিক নহে। এই ধারণা একটি অলিক ধারণা মাত্র। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কোরআন করীম 'কুছালা'র অবস্থাকে 'ইউরায়ুনা'র (লোক দেখানোর) অবস্থার সহিত সংযুক্ত করিয়া সর্বত্র এই বিষয়ে একই ধরণের পন্থা এখতেয়ার করিয়াছে। কোথাও এক জায়গায়ও কেবলমাত্র শৈথিল্যের অবস্থায় নামাজ পড়াকে ঐ গুনাহ ও অপরাধ সাব্যস্ত করা হয় নাই,

যাহার ফলশ্রুতিতে নামাজ মানুষকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যায়। ভাবের প্রকোপের দরুণ (অর্থাৎ নামাজের মধ্যে খোদার স্মরণ ছাড়া অন্য কোন পার্থিব চিন্তা ভাবনার প্রকাপের দরুণ) কোথাও কোরআন করীমে বলা হয় নাই যে, এইরূপ ব্যক্তির নামাজ অনিবার্যরূপে রদ করিয়া দেওয়া হইবে এবং এই নামাজ গুনাহ্‌র কারণ হইয়া যাইবে। কোন কোন জোড়া মিলিয়া একটি পরিপূর্ণ বিষয় বস্তু তৈয়ার হয় এবং যেখানেই মন্দ নামাজের কথা বলা হইয়াছে এবং ধ্বংসকারী নামাজের কথা বলা হইয়াছে সেখানেই আপনারা 'রীয়া' এবং 'শৈথিল্যের' জোড়া একত্রে দেখিতে পাইবেন। অর্থাৎ অপরাধী বানানোর জন্য নামাজে দুইটি শর্ত একত্রিত হওয়া জরুরী।

বস্তুতঃ অন্য যে আয়াতটি আমি তেলাওয়াত করিয়াছিলাম, উহাতে আল্লাহতায়ালা বলেন وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ০ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ। ধ্বংস হউক ঐ সকল নামাজী, অভিসম্পাত বর্ষিত হউক ঐ সকল নামাজীর উপর যাহারা নিজেদের নামাজের প্রতি শৈথিল্য এখতেয়ার করে এবং অতঃপর সংকোচ ব্যতীত, বিরতী ব্যতীত এবং 'অবায়' ব্যবহার না করিয়া বলা হইয়াছে الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ। অর্থাৎ এই সকল শৈথিল্যকারী নামাজীদের উপরই অভিসম্পাত বর্ষিত হউক, যাহাদের মধ্যে 'রীয়া'র অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপর অন্য একটি আয়াতে বলা হইয়াছে لَا يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ এই পূর্ণ আয়াতগুলিতেও এইরূপ নামাজীদের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা রীয়া'র খাতিরে, হৃদয়ে ঈমান না থাকা সত্বেও নামাজ আদায় করে এবং তাহাদের মধ্যে এই দুইটি বৈশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা নামাজ শৈথিল্যের অবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং খোদার রাস্তায় ব্যয় করা হইতে বিরত থাকে এবং ইহাতে বড়ই বোঝা অনুভব করে।

অতএব প্রথমে এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঐ প্রাথমিক পর্যায়ের মোমেন এবং ঐ সালেক (পথ পরিক্রমণকারী), যে অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় নামাজের মর্মকথা বুঝিতে পারে না এবং ইহার অন্তরাত্মা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না, যে জানে না যে এই পথে কিভাবে চলিতে হয়, যে বিশ্বস্ততার সহিত চেষ্টা করে, কিন্তু হুচট খাইয়া পড়িয়া যায়, যে চায় যে প্রিয়তমের মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়, কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত ও অসহায় অবস্থায় রাস্তায় হুচটের শিকার হইতে থাকে, এরূপ নামাজীদের উপর কোরআন করীম কোথাও অভিসম্পাত বর্ষণ করে নাই এবং এইরূপ নামাজ রদ হওয়ার ব্যাপারে কোন এলানও করে নাই। বরং يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ (সালাত অর্থাৎ নামাজ কায়েম করে) এর অবস্থা বলিতেছে যে, মোমেনদের নামাজের ক্ষেত্রে এই বিপদ প্রযোজ্য হইবে এবং প্রত্যেকটি ওয়াকতে তাহারা নিজেদের নামাজকে দণ্ডায়মান রাখার উদ্দেশ্যে 'ইস্তেকামত' (দৃঢ়চিত্ততা) লাভ করার জন্য চেষ্টা করিতে থাকিবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে তাহা হইলে উহা কি পদ্ধতি যাহার মাধ্যমে আমরা নিজেদের নামাজকে সঠিক করিতে পারি এবং যাহার মাধ্যমে আমাদের নামাজের কেবলা সঠিক হইয়া যাইবে? ইহার জন্য নামাজের বাহিরে সমাধান খোঁজার প্রয়োজন নাই। খোদার নামাজের মধ্যেই এই প্রশ্নের সমাধান নিহিত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি নেক নিয়তের সহিত আল্লাহতায়ালার হুজুরে নিজের মনোযোগ ও ধ্যান নিবদ্ধ করিতে চায়, যে ব্যক্তি বিশ্বস্ততার সহিত এই চেষ্টা করে যে, আল্লাহতায়ালা তাহার প্রয়োজন, তাহার মুনাজাত এবং তাহার

আশা-আকাঙ্খার কেবলা হইয়া যাইবে, এইরূপ ব্যক্তির জন্য খোদ নামাজেই ঐ ব্যবস্থা মওজুদ রহিয়াছে, যাহা তাহার কেবলাকে সঠিক করিতে থাকে এবং তাহার কেবলা সঠিক করার ব্যাপারে তাহার সাহায্যকারী হয়।

সর্বপ্রথম সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং চিন্তনীয় বিষয় এই যে, নামাজে 'আল্লাহু আকবর' (আল্লাহ সর্ব শ্রেষ্ঠ) এর এত পুনরাবৃত্তি কেন রাখা হইয়াছে এবং কেন নামাজের প্রত্যেক মোড়ে আমাদিগকে 'আল্লাহু আকবর' বলার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে? সূচনাতেও 'আল্লাহু আকবর' বলিতে হয় এবং নামাজের প্রতেকটি দৈহিক সঞ্চালনেও 'আল্লাহু আকবর' বলিতে হয়। কেবল মাত্র 'সামেয়াল্লাহু লেমান হামেদাহ্' বা শেষ 'আসসালামোয়ালাইকুম' বলার সময় 'আল্লাহু আকবর' বলিতে হয় না। 'আসসালামোয়ালাইকুম' তো নামাজ হইতে বাহিরে লইয়া যায়। এই জন্য ইহার সহিত 'আল্লাহু আকবরের' সম্পর্ক নাই ('সামেয়াল্লাহু লেমান হামেদাহ্' এর একটি ভিন্ন আওয়াজ ছাড়া প্রত্যেকটি দৈহিক সঞ্চালনে 'আল্লাহু আকবর' আওয়াজ বোলন্দ করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, 'আল্লাহু আকবর' হইল কেবলা নির্দেশক। 'আল্লাহু আকবর' এই কথা বলিয়া দেয় যে, তোমাদের কেবলা কোন্ দিকে ছিল এবং তোমাদের মুখ কোন্ দিকে ফিরানো উচিত। কেননা মানুষের নামাজে যে সকল বিভিন্ন প্ররোচনা তাহার মনোযোগকে সরাইয়া নেয় এবং যে সকল বিভিন্ন ভাব ও ভাবনা তাহার গতিকে খোদার দিক হইতে সরাইয়া অন্যান্য বস্তুর দিকে লইয়া যায়, এগুলি অনেক ধরনের হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, চিন্তা-ভাবনা পাহারায় দিতে থাকে এবং ঐ গুলি খোদাতায়ালার প্রতি মনোনিবেশ করিতে বাধা দিতে থাকে। যাহারা খোদার খুব পবিত্র বান্দা এবং যাহারা এই পথে অধিক অগ্রগামী, তাহাদিগকেও চিন্তা-ভাবনা কোন কোন সময় পেরেশান করে। এমন কি, কোরআন করীম হইতে অবগত হওয়া যায় যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকেও কোন কোন সময় উহারা (অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা) নামাজের মধ্যে ও ইবাদতের মধ্যে আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিত। কিন্তু ঐ সকল চিন্তা-ভাবনা ধর্মের জন্য চিন্তা-ভাবনা ছিল। ঐ গুলি ছিল আল্লাহর চিন্তা। যাহাহউক, মানুষ মানুষই। খোদাতায়ালার পথে মনোসংযোগ করার ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা একটি বাধা হইয়া দাঁড়ায়। আরও একটি পার্থক্য এই যে, প্রাথমিক পর্যায়ের মোমেনের চিন্তা-ভাবনা তাহার নামাজের উপর প্রাধান্য লাভ করে এবং খোদার রাস্তায় যাহারা অগ্রগামী অথবা যাহারা নামাজে উচ্চ মোকাম হাসেল করিয়াছে, তাহাদের চিন্তা-ভাবনার উপর ঐ সত্তা (অর্থাৎ খোদার সত্তা) প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে এবং এক ঝটকা মারিয়া এই সকল চিন্তা-ভাবনাকে ছুড়িয়া ফেলে। অতএব প্রত্যেক মোড়ে যখন আপনারা 'আল্লাহু আকবর' আওয়াজ ধ্বনিত করেন, তখন 'আল্লাহু আকবর' আপনাদিগকে বলিয়া দেয় যে, খোদা সব চাইতে বড়; যাহার সহিত খোদার সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহার দৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনার কোন মূল্য থাকা উচিত নয়। চিন্তা-ভাবনা দুনিয়ার জন্যই হউক বা দীনের জন্যই

হউক, এমতাবস্থায় 'আল্লাহু আকবর' হৃদয়কে শান্ত্বনাও দান করে, সাহসও দান করে এবং কেবলাও সঠিক করিয়া দেয়। বলা হইয়াছে যে, চিন্তা-ভাবনার ফলশ্রুতিতে খোদার দিকে তোমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত. কিন্তু তোমরা খোদার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া চিন্তা ভাবনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

অতএব 'আল্লাহু আকবর' নামাজের জন্য কেবলা নির্দেশক হইয়া যায়। অতঃপর কোন কোন সময় মানুষের কামনা বাসনা তাহার মনোযোগ খোদার তরফ হইতে সরাইয়া দেয়। কাহারো কাহারো ভ্রমণের সখ আছে। কাহারো কাহারো খেলাধূলার সখ আছে। কাহারো কাহারো বন্ধু বান্ধবের সহিত আড্ডা জমানোর সখ আছে। কাহারো কাহারো বই-পুস্তক পড়ার সখ আছে। কোন মজার বই পড়িতে পড়িতে নামাজের সময় হইয়া গেল এবং সে বই উল্টাইয়া রাখিয়া নামাজের জন্য দৌড়াইল এবং বই তাহার ভাব ও ভালবাসার গলায় শিকল পরাইয়া দিল। নামাজ পড়িতে পড়িতে বইয়ের বিষয়বস্তু আবার তাহার মনে আসিতে আরম্ভ করে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মনোযোগ থাকে খাদ্যের প্রতি এবং উহা তাহাকে নামাজ পড়িতে দেয় না। বার বার নামাজের মধ্যে তাহার এই কথা মনে হয় যে, নামাজ শেষ করিলে খানা খাইতে পারিব। অধিকাংশ নামাজে 'কুছালা'র অবস্থা এই সকল কারণেই দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোক, যাহারা সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় মোনাফেক নয় এবং সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় গুনাহ্‌গার নয়, কিন্তু আমলের দিক হইতে তাহাদের নামাজেও কার্যতঃ মোনাফেকাতের (কপটতার) একটি রঙতো নিশ্চয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ইহা ঐ রঙ যাহা মানবীয় দুর্বলতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এবং ইহার ফলশ্রুতিতে বার বার বিভিন্ন ধরণের মনোযোগ মানুষের চেহারাকে তাহার নিজের দিকে ফিরাইয়া দেয়।

অতএব 'আল্লাহু আকবর'-এর পুনরাবৃত্তি এইরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ লইয়া আপনাদের সম্মুখে আসিবে। 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া দিবে যে, তুমিতো বলিতে যে খোদা সব চাইতে বড়। এখন খাওয়াটাই তোমার নিকট সব চাইতে বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। তুমিতো বলিতে যে খোদা সব চাইতে বড়। এখন টেলিভিশনই তোমার নিকট সব চাইতে বড় মনে হইতেছে। তুমিতো বলিতে যে খোদা সব চাইতে বড়। এখন রেডিওই তোমার নিকট খুব বড় মনে হইতেছে। তুমি তো বলিতে যে খোদা সব চাইতে বড়। এখন অমুক খেলাটা তোমার নিকট অধিক বড় মনে হইতেছে এবং বন্ধুদের মজলিস তোমার নিকট অধিক বড় বলিয়া মনে হইতেছে। অতএব নামাজের কেবলা সঠিক করার জন্য 'আল্লাহু আকবর' একটি আশ্চর্যজনক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এই জন্য যাহার মনোযোগ 'আল্লাহু আকবর'-এর বিষয়বস্তুর প্রতি নিবদ্ধ থাকে, অন্ততঃপক্ষে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় যাওয়ার সময় তাহার 'আল্লাহু আকবর' বলার আরও একটি খুব উত্তম ফায়দা রহিয়াছে এবং আরও একটি মহান ফায়দা রহিয়াছে যে, প্রত্যেক দেহ সঞ্চালন তাহাকে (পার্থিব) চিন্তা ভাবনা হইতে জাগ্রত করিয়া দেয়। সমস্যার জালে জড়িত মানুষকে দেহ সঞ্চালন অকস্মাৎ ঝাঁকুনী দিয়া জাগ্রত করিয়া দেয় এবং হিলাইয়া দেয় এবং তাহাকে বুঝানোর জন্য উহাই হইল উত্তম সময় যে, তুমি যাইতে চাহিতেছিলে কোন এক দিকে, কিন্তু যাইতেছ অন্য আরেক দিকে।

অতএব 'আল্লাহু আকবর'-এর পুনরাবৃত্তি যদি আপনারা বুঝিয়া শুনিয়া করেন, তাহা হইলে ঐ সময় মনের অবস্থাও এইরূপ থাকে যে মানুষ ইহার (অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবর'-এর) প্রভাব অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং 'আল্লাহু আকবর' সম্বন্ধে ইহাই বলিতে হয় যে, ইহা কেবলাকে সঠিক করে। নামাজ সম্বন্ধে এই কথা বলিতে হয় যে ইহা (অর্থাৎ নামাজ) মানুষের কেবলাকে সঠিক করে অর্থাৎ নামাজীর কেবলাকে সঠিক করে। ইহার ফলশ্রুতিতে আরও একটি বড় ফায়দা লাভ করা যায়। উহা হইল নিজের নফসের বিশ্লেষণ। প্রত্যেক মানুষ নামাজের কেবলা নির্দেশকের মাধ্যমে এই কথা অনুভব করিতে পারে যে, তাহার প্রকৃত মনোযোগের কেন্দ্র

কতখানি খোদা এবং কতখানি অন্যান্য আশা-আকাংখা ও কামনা-বাসনা এবং কতখানি সে ধর্মকে দুনিয়ার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করার যোগ্য হইয়াছে এবং কতখানি সে হয় নাই। তাহা হইলে ভাব, ও ভাবনা বিভিন্ন অবস্থায় পাকড়াও হইয়া যাইবে। প্রতিটি 'আল্লাহু আকবর'-এর সময় ঐ ব্যক্তি যাহার মনোযোগ খোদার প্রতি কায়েম নাই, সে তাহার ভাব ও ভাবনাকে বিভিন্ন অবস্থায় পাকড়াও করিবে এবং ঐ সময় সে সঠিকভাব আন্দাজ করিতে পারিবে যে তাহার আভ্যন্তরীন মানুষটি কিরূপ (অর্থাৎ তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিরূপ), কতখানি সে খোদার, কতখানি তাহার দাবীতে সে সত্যবাদী, তাহার মধ্যে কি পরিমাণ দোষ ত্রুটি রহিয়াছে এবং ঐগুলি কোন্ পর্যায়ের দোষ-ত্রুটি, তাহার মধ্যে খোদার রাস্তায় বাধা সৃষ্টিকারী কুপ্ররোচনা এবং নফসানী শয়তান কি কি বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উহাদের চেহারা কিরূপ এবং এইগুলিকে সংশোধন করার জন্য তাহার নিকট একটি সুবর্ণ সুযোগ আসিয়া যায়। কেননা এইরূপ দুশমন, যাহাকে না চেনা যায় এবং না জানিতে পারা যায় যে, সে কোন দিক হইতে হামলা করিতেছে, তাহার তুলনায় ঐ দুশমন যাহাকে চিনিতে পারা যায়, তাহাকে পরাজিত করা অধিক সহজসাধ্য হয়। অতএব নামাজ কেবলা নির্দেশকও এবং অন্যদিকে ইহা দুশমনকে নিরূপন করার জন্যও খুব সাহায্য করে এবং এই ফয়সালার ক্ষেত্রে বারম্বারের 'তকবীর' (অর্থাৎ আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দেওয়া) সব চাইতে গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতঃপর সাধারণতঃ এই কথা প্রত্যেক মানুষের জ্ঞানে আসে যে, যে বস্তুর আকর্ষন শক্তি অধিক, তাহা ঐ বস্তুর মোকাবেলায় যাহার আকর্ষণ শক্তি কম, উহা অধিক শক্তির সহিত শেষোক্ত বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এমনিতে তো পৃথিবীর সকল বস্তু একে অন্যকে আকর্ষণ করিতেছে। এমন একটি অণু-পরমাণুও নাই, যাহা অন্য অণু-পরমাণুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছে না এবং অন্য অণু-পরমাণু উহাকে (অর্থাৎ প্রথোমোক্ত অণু-পরমাণুকে) নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছে না। কিন্তু আমরা একে অন্যের সহিত ধাক্কা খাইতেছি না। আমরা দেওয়ালের সহিত লাগিয়া যাইতেছি না। আমরা পাহাড়ের সহিত গিয়া লাগিতেছি না। ইহা এই জন্য যে, পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি সাধারণতঃ অধিক শক্তির সহিত আমাদিগকে উহার নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছে।

অতএব এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে আমরা নিশ্চিতরূপে নিরূপন করিতে পারিব যে, আল্লাহতায়ালার আকর্ষণের মোকাবেলায় কোন্ কোন্ ঐ সমস্ত শক্তি রহিয়াছে, যাহারা বার বার আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং আমাদের কেবলাকে বাঁকা করিয়া দেয় এবং কেন খোদার আকর্ষণ ইহাদের উপর জয়যুক্ত হয় না। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যখন আপনারা নামাজে নিজেদের নফসের বিশ্লেষণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া যাইবেন এবং বার বার 'আল্লাহু আকবর'-এর সাহায্যে নিজেদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ-কলহকে নিরূপন করিবেন, তখন আপনারা নিজেদের মধ্যে অসংখ্য গোপন প্রতিমা দেখিতে পাইবেন এবং গোপন শেরেকের বিভিন্ন চেহারা নিজেদের সত্তার মধ্যে দেখিতে পাইবেন। সুতরাং এমতবস্থায় নামাজ একটি আয়নায় পরিণত হয়, যাহা আয়না-খানার যেখানে অনেক আয়না একসঙ্গে মওজুদ আছে) দৃশ্য সৃষ্টি করে। অর্থাৎ নামাজের আয়না-খানায় যেদিকে আপনি তাকাইবেন, কোন না কোন গোপন প্রতিমা, কোন না কোন গোপন শেরেকের উপাদান আপনি দেখিতে পাইবেন, এবং ইহাকে শুদ্ধ করার সময় প্রত্যেক প্রচেষ্টার পর আপনারা তুলনামূলকভাবে অধিক তওহিদবাদী হইতে থাকিবেন এবং খোদার অধিক নৈকট্য লাভ করিতে থাকিবেন। অতএব খোদার সমীপে এই যে ক্রীয়া, ইহা ঐ কবুলিয়ত প্রাপ্ত (গৃহিত) ক্রীয়া যাহা দুর্বল মানুষদের নামাজকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদায় পেঁছাতে থাকে। এই জন্য এই ধারণা ও চিন্তা অহেতুক যে, একজন দুর্বল মানুষের নামাজ সম্পূর্ণরূপে রদ করিয়া দেওয়া হয়, অতএব তাহার নামাজ পড়ার প্রয়োজন নাই। যদি সচেষ্ট হইয়া ও জাদ্দো-জেহাদ করিয়া মানুষ নামাজ পড়ে, তাহা হইলে তাহার পূর্বের অবস্থার তুলনায় বর্ত্তমান অবস্থার সামান্য পার্থক্য-কেও আল্লাহতায়ালা কবুল করেন এবং ঐ মামুলী ধরণের ক্রীয়া, যাহা 'গায়েব-উল্লাহ'র (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো বা অন্য কিছুর) মোকাবেলায় আল্লাহর সমীপে সম্পাদন করা হয়, উহাকেও আল্লাহতায়ালা কবুল করিয়া থাকেন। এই জন্য

কোরআন করীমে আল্লাহতায়ালা বলেন وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ যে, তোমরা জান না যে খোদাতায়ালা কত সূক্ষ্ম ও ওয়াকেবহাল এবং তিনি স্বীয় বান্দাদিগকে কত দান করিয়া থাকেন। মামূলী হইতে মামূলী অণু রহিয়াছে। অণু পরিমাণ নেকী, যাহা তোমরা কর, উহাও বিনষ্ট হয় না। উহাও খোদার রাস্তায় গৃহীত হইয়া যায়।

অতএব, ইহা একটি সুদীর্ঘ জাদ্দো-জেহাদ, যাহা নামাজী বিশ্বস্ততার সহিত খোদার সমীপে নিজের দিক নির্দেশনাকে সঠিক করার জন্য সম্পাদন করে। উহার প্রতিটি অংশ তাহাকে খোদার নিকটতর করিয়া দিতে থাকে এবং তাহার প্রত্যেকটি পরবর্ত্তী নামাজ পূর্ববর্ত্তী নামাজের তুলনায় অধিক সুন্দর হইতে থাকে। এই জন্য নামাজ তো খুবই একটি আজীমুশ্‌শান জেহাদ এবং খুবই একটি এইরূপ ব্যাপক জেহাদ যে, যদি মানুষ একটি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করা ছাড়াও ক্রমাগত কয়েকটি জীবন লাভ করে এবং সে এই জেহাদ করিতে থাকে, তথাপি সে উহার অপর প্রান্তে গিয়া পৌঁছিবে না। কিন্তু যদি এই গোটা জেহাদের সময়কালকে সমগ্র মানব জাতির বয়সের মধ্যেও বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হয়, তথাপি এইরূপ একটি মোকামও আসিবে না, যেখানে সে দাঁড়াইয়া যাইবে। কেননা তাহার নামাজের অবস্থা সঠিক করার জন্য খোদ নামাজেই এইরূপ ব্যাবস্থ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং এইরূপ উপাদান বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা সব সময় তাহাকে একটি নতুন সৌন্দর্য দান করিতে থাকে।

দ্বিতীয় দিকটি, যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নামাজকে উত্তম বানানোর পথ পাওয়া যায়, বরং এইরূপ বলা উচিত যে ইহা সাধারণ দিক, যাহা সবকিছুর ব্যাপারে প্রযোজ্য, তাহা হইল এই যে নামাজের প্রতিটি অংশে যাহা কিছু পাঠ করা হয় উহার সম্বন্ধে মানুষ মনযোগসহকারে ভাবিবে এবং এইরূপ ভাবার সময় সে অনেক কিছু লাভ করিতে আরম্ভ করিবে। নামাজের অবস্থায় নামাজের বিভিন্ন অংশের উপর মনোযোগসহকারে ভাবা এবং ঐ সকল কথার উপর ভাবা, যাহা মানুষ নামাজে পড়ে, উহাই হইল 'জেকরুল্লাহ্' (আল্লাহর জেকের)। ইহার ফলশ্রুতিতে সে আল্লাহতায়ালা সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান এবং আল্লাহতায়ালার মহান পুণ্যাবলী সম্বন্ধে অধিক উত্তম জ্ঞান এবং খোদাতায়ালার গুণাবলীর রঙকে নিজের করিয়া লওয়ার জন্য অধিক উত্তম সুযোগ লাভ করিতে আরম্ভ করে এবং অনেক এইরূপ কথা মানুষ অবগত হয়, যাহার সম্বন্ধে মনযোগসহকারে না ভাবিয়া যদি কোটি কোটি বারও আপনারা নামাজে এইগুলি পড়িতে থাকেন, তথাপি আপনারা এইগুলি জানিতে পারিবেন না। অর্থাৎ নামাজের পথে অসংখ্য তত্ত্বজ্ঞান ছড়াইয়া রহিয়াছে। আমরা দৈনিক এইগুলি অতিক্রম করিতে থাকি (অর্থাৎ আমরা দৈনিক এইগুলি নামাজে পড়িতে থাকি)। কিন্তু আমরা মনোযোগ দেই না এবং চিন্তা করি না যে, কি অবস্থায় আমরা এইগুলি অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছি। উদাহরণস্বরূপ, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ আমরা এই দোওয়া প্রত্যেক নামাজের প্রত্যেক রাকাতে পাঠ করিয়া থাকি। সূরা ফাতেহা ব্যতীত নামাজ কায়েমই থাকিতে পারে না। ইহা নামাজের জীবন। সূরা ফাতেহা প্রত্যেক রাকাতে না পড়িলে নামাজই হয় না। সূরা ফাতেহার প্রথম অংশের উপর আমি বিভিন্ন সময়ে আলোকপাত করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ইহার চাইতে অধিক গভীরভাবে ও অধিক ব্যাপকতার সহিত এবং অধিক তত্ত্বজ্ঞানের সহিত হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম সূরা ফাতেহার আজীমুশ্‌শান সৌন্দর্যের উপর আলোকপাত করিয়াছেন। কেন্তু সূরা ফাতেহা তো সীমাবদ্ধ নয়। ইহার বিষয়-বস্তুতো সদাসর্বদা জারী থাকিবে এবং যদি সকল সমুদ্রও শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি সূরা ফাতেহার তত্ত্বজ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া যাইবে না। এই জন্য প্রত্যেক যুগে ইহার নিত্য নূতন অর্থের প্রতিও মনোযোগ ধাবিত হইতে থাকিবে। প্রত্যেক নামাজীকে আমি পুনবার বলিতেছি যে, যদি সে নামাজে সূরা ফাতেহা সম্বন্ধে গভীরভাবে, ভাবে, তাহা হইলে প্রত্যেক রাকাতে এবং প্রত্যেক আয়াতে নূতন নূতন অর্থ আহার দৃষ্টিগোচর হইতে আরম্ভ

করিবে এবং ইহা তাহার পরিস্থিতি ও অবস্থা অনুযায়ী হইবে। ইহা এত ব্যাপক বিষয়বস্তু যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যে সূরা ফাতেহা পাঠ করে, তাহার ধারণ-ক্ষমতা ও জ্ঞান অনুযায়ী উহার অর্থে কিছু না কিছু ভিন্নতা ও নতুনত্ব নিশ্চয়ই দেখা দিবে। এইজন্য যদি কোটি কোটি মানুষও সূরা ফাতেহা সম্বন্ধে চিন্তা করে, তাহা হইলে তাহাদের জ্ঞানে সূরা ফাতেহার যে অর্থ উদভাসিত হইবে, উহা অন্যান্য মানুষ হইতে কোন না কোন দিক হইতে নিশ্চয়ই ভিন্ন হইবে। মানুষ যাহা কিছু নামাজে পড়ে, যদি সে উহাদের মধ্যে ডুব দিতে আরম্ভ করে এবং উহাদের সম্বন্ধে গভীরভাবে ভাবিতে শুরু করে, তাহা হইলে নামাজের অবস্থার মধ্যে খুবই অধিক সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইয়া যাইবে এবং মানুষকে আল্লাহতায়ালা নিত্য নূতন তত্ত্বজ্ঞান দান করিতে থাকিবেন।

اهدنا الصراط المستقيم দোওয়া বিশেষভাবে নামাজকে সিধা করার ক্ষেত্রে এবং নামাজকে সঠিক করার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হইয়া থাকে। اهدنا الصراط المستقيم দোওয়া হইতে আমরা জানিতে পারি যে, যে 'সেরাত' অর্থাৎ যে পথ আমরা চাহিতেছি, উহা নামাজের মধ্য দিয়াই অতিক্রম করিতেছি। ঐ পথ যাহার উপর সকল পুরস্কার পড়িয়া রহিয়াছে, উহা নামাজেরই পথ। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নামাজের পথে চলিয়া উক্ত পুরস্কারগুলিকে লাভ করার জন্য চেষ্টা করিব না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কেবলমাত্র এক স্বপ্নের দুনিয়াতে বাস করিতে থাকিব এবং প্রকৃতপক্ষে উক্ত পুরস্কার আমরা কখনো লাভ করিতে পারিব না। এই বিষয়টি সম্বন্ধে চিন্তা করিলে জানিতে পার যায় যে, কোন নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহা পাঠ জরুরী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। اهدنا الصراط المستقيم এ-তে পুরস্কার প্রাপ্তদের যে রাস্তা নিরূপন করা হইয়াছে, কোরআন করীম হইতে সুস্পষ্টভাবে অবগত হওয়া যায় যে, উহাদের মধ্যে চারিটি পুরস্কার, চারটি মর্তবা লাভ করা যায়। প্রথম মর্তবা হইল সালেহীয়াতের মর্তবা (অর্থাৎ নেক বান্দাদের মর্তবা) দ্বিতীয় মর্তবা হইল শাহাদাতের মর্তবা। তৃতীয় মর্তবা হইল সিদ্দীকীয়াতের মর্তবা এবং চতুর্থ মর্তবা হইল নবুয়তের মর্তবা। অতএব নামাজ যে পরিমাণে সঠিক হইবে এবং সুন্দর হইবে, ঐ পরিমাণে মানুষ পর্যায়ক্রমে এই সকল মর্তবা ও নৈকট্য লাভ করিতে থাকিবে। অতএব স্মরণ রাখুন, যদি আপনার নামাজ 'সালেহ' (শুদ্ধ) না হয় তাহা হইলে আপনি ঐ রাস্তায় চলিতেছেন না, যাহার উপর সালেহীয়াতের পুরস্কার পড়িয়া রহিয়াছে। নামাজ 'সালেহ' হইলে আপনি 'সালেহ' বলিয়া কথিত হইবেন। যদি নামাজ অশুদ্ধ থাকে, তাহা হইলে ঐ মানুষ যে অশুদ্ধ নামাজ পড়ে, সে 'সালেহ' হইতে পারে না। অতএব এক বিন্দু-বিসর্গও নামাজের বাহিরে পুরস্কার নাই। সকল পুরস্কার নামাজের ভিতরে আসিয়া গিয়াছে। 'সাহাদাত' সম্বন্ধে কার্য্যতঃ এই ধারনা বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেবল মাত্র যেন খোদার পথে জীবন দেওয়ার নাম সাহাদাত। কিন্তু কোন কোন সময় খোদার পথে এমতাবস্থায় জীবন দেওয়া হয় যখন ইহার উপর মানুষের নিয়ন্ত্রন থাকে না, এবং সে জীবন দিতে বাধ্য হয়। যায়তো সে খোদার পথেই। কিন্তু কোন আক্রমণকারী তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসিল। ইহাতে সে অসহায় ছিল এবং মজবুর ছিল। আক্রমণকারীর চোখের দিকে তাকাইয়া তাহার প্রতি অগ্রসর হওয়ার পথে জীবন দেওয়া এক কথা এবং খোদার পথে এবং খোদার জন্য এমনিতে মরিয়া যাওয়া অন্য কথা। অতএব শাহাদাতেরও অনেক মর্তবা রহিয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক

শহিদের পদ মর্য্যাদা এক হয় না। এই জন্য হযরত সাহেবজাদা আবদুল লতীফ সাহেব শহিদের শাহাদাতের উপর হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম একটি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তক পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, বাহ্যতঃ সাহাদাত একটি উপাধি। কিন্তু ইহার মধ্যেও এত বিভিন্ন মর্ত্তবা রহিয়াছে যে ইহাকে সফর বলিয়া মনে হয়, যেন কখনো ইহা শেষই হইবে না। অর্থাৎ এমন নয় যে, আপনি সালেহীয়াতে প্রবেশ করিলেন এবং অকস্মাৎ সালেহীয়াত শেষ হইয়া গেল এবং অপনি অতঃপর শাহাদাতের দিকে রওয়ানা হইলেন। সালেহীয়াতের একটি সুদীর্ঘ পথ রহিয়াছে, যাহা কোন কোন সময় মানুষের সমগ্র জীবনে ব্যাপ্ত থাকে। এতদসত্বেও সালেহীয়াতের মধ্যেও মানুষের সফর শেষ হয় না এবং তাহার পরবর্ত্তী পদমর্য্যাদার পালা আসে না। অতএব ঐ সাহাদাতও রহিয়াছে, যাহা জীবন দেওয়ার ফলে লাভ করা যায়। কিন্তু ইহার পশ্চাতে একটি রুহ (আত্মা) রহিয়াছে। যদি উক্ত রুহ মওজুদ না থাকে, তাহা হইলে উক্ত সাহাদাত সাহাদাত নহে। 'সহিদ' নাম এই জন্য রাখা হইয়াছে যে, সাহাদাত প্রাপ্ত ব্যক্তি খোদাকে সরাসরিভাবে দেখিতে পায় এবং সে জানে তাহার এক খোদা রহিয়াছেন, যাহার নিকট সে প্রত্যাবর্তন করিবে। যে পরিমাণে এই হাজের হওয়ার মোকাম কেহ অর্জন করে, যে পরিমাণে তাহার সাক্ষ্যের মধ্যে জোর দেখিতে পাওয়া যায় এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দেখিতে পাওয়া যায় যে, হাঁ, একজন খোদা রহিয়াছেন, সেই পরিমাণে সাহাদাতের মোকাম উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে এবং ইহা এইরূপ একটি মোকাম যাহা খোদার পথে একদম জীবন দেওয়া ব্যতীতও লাভ করা যায়। ইহা ভুল যে কেবলমাত্র জীবন দানকারীদিগকে সহিদ বলা হয়। নবীগণও সহিদ হইয়া থাকেন এবং নবীগণের মধ্যে সালেহীয়াত, সাহাদাত, সিদ্দীকীয়াত এবং নবুয়ত—এই চারিটি মর্ত্তবা পৃথক পৃথক থাকে না যে, নবী প্রথমে সালেহ ছিলেন, অতঃপর তিনি সহিদ হইলেন, অতঃপর তিনি সাহাদাতের গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া সিদ্দীকীয়াতের গণ্ডীতে প্রবেশ করিলেন এবং অতঃপর তিনি সিদ্দীকীয়ত হইতে নবুয়তে প্রবেশ করিলেন। বরং নবীগণ চারিটি মর্ত্তবা একই সময়ে লাভ করেন এবং তাহাদের প্রত্যেকটি মর্ত্তবা উহার পরিপূর্ণ স্তরে পৌঁছিয়া থাকে। এই জন্যই কোরআন করীমে নবীগণের জন্য 'সালেহ' শব্দটিও ব্যবহার করা হইয়াছে, 'সিদ্দীক' শব্দটিও ব্যবহার করা হইয়াছে, 'সহিদ' শব্দটিও ব্যবহার করা হইয়াছে, এবং 'নবী' শব্দটিও ব্যবহার করা হইয়াছে। যাহারা স্বল্প-জ্ঞান সম্পন্ন এবং যাহারা গভীরভাবে চিন্তা করে না, তাহারা মনে করে যে, কোন কোন নবী 'সালেহ' ছিলেন, কোন কোন নবী 'সিদ্দীক' ছিলেন এবং কোন কোন নবী 'সহিদ' ছিলেন। ইহা হইতেই পারে না। প্রত্যেক নবী অনিবার্য্যরূপে 'সালেহ'ও হইয়া থাকেন, অনিবার্য্যরূপে 'সহিদ'ও হইয়া থাকেন, অনিবার্য্যরূপে 'সিদ্দীক'ও হইয়া থাকেন এবং অনিবার্য্যরূপে 'নবী'ও হইয়া থাকেন।

অতএব জীবনে সাহাদাত লাভ করার ভেদ নামাজ শিখায় এবং নামাজ কেবলমাত্র জীবনে সাহাদাত লাভ করার ভেদই শিখায় না, বরং নামাজ বলিয়া দেয় যে, হাঁ, তোমর সাহাদাত লাভ করার সৌভাগ্য হইবে। সুতারাং ঐ নামাজ, যদ্বারা খোদা অদৃশ্য হইতে দৃশ্যে আসিয়া যান, ঐ নামাজ, যাহা 'আলেমুল গায়েব ওয়াশশাহাদাত'কে (যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন —অর্থাৎ আল্লাহতায়ালাকে) অদৃশ্য জগত হইতে দৃশ্যমান জগতে অবতরণ করাইয়া দেয়, ঐ নামাজই সাহাদাতের মোকাম বা মর্যাদা রাখে এবং ঐ নামাজই নামাজীকে সহিদ বানাইয়া দেয়। অতঃপর তাহার জীবন খোদার পথে চলিয়া যাক বা না যাক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। তাহার উঠা-বসা, তাহার মরা-বাঁচা সব কিছু খোদার জন্য হইয়া যায়। (ক্রমশঃ)

(কাদিয়ান হইতে প্রকাশিত সপ্তাহিক 'বদর' পত্রিকা, ৬ই মার্চ, ১৯৮৬ইং)

অনুবাদ : **নাজির আহমদ ভূইয়া**

জুময়ার খোৎবা

(সার সংক্ষেপ)

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২৮শে মার্চ '৮৬ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

মালী কোরবানী ও নেযামে-ওসিয়ত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী ঃ "ভারতে গৃহ-সম্প্রসারণ ফাণ্ড" সম্পর্কীয় তাহ্‌রীকের ঘোষণা ঃ

তাশহুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন, আয়াতটি তরজমাসহ নিম্নরূপ ঃ

يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتى يوم لا بيع فيه و لا خلة و لا شفاعة - والكافرون هم الظالمون ০

তরজমা ঃ "হে ঈমানদারগণ! যাহাকিছু আমরা তোমাদিগকে দান করিয়াছি উহার মধ্য হইতে যে দিন কোন প্রকারের ক্রয়-বিক্রয় (কার্যকরী) হইবে না, সে দিনের আগমনের পূর্বেই (খোদার পথে যথাসাধ্য) ব্যয় কর ; এবং (এই আদেশ) অস্বীকারকারীগণ (নিজেদের উপরই) অত্যাচারকারী হইবে।"

অতঃপর হুজুর বলেন ঃ উক্ত আয়াতে আল্লাহতায়ালা এ উপদেশ দান করেন যে, হে যারা ঈমান এনেছ! যে দিন কোন সওদাবাজী চলবে না, কোন বন্ধুত্বও কাজে আসবে না এবং সুপারিশও চলবে না, সে দিনটি আসার পূর্বেই, আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তার মধ্য থেকে তাঁর পথে যথাসাধ্য খরচ কর। হুজুর (আইঃ) বলেন যে, এ আয়াতটিতে সওদাবাজী সংক্রান্ত যে অংশটি রয়েছে তা বুঝার ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা দেখা দেয়।

এ বিষয়বস্তুটি যখন আমরা কুরআন শরীফের কোন কোন অন্য আয়াতে আরও স্পষ্টরূপে দেখতে পাই তখন আরও জটিলতা সামনে এসে উপস্থিত হয়। কুরআন করীম অন্যত্র বলে যে, "সে দিনটিকে ভয় কর, যে দিন তোমাদের গোনাহর বিনিময় হিসেবে উহার সমপরিমাণ কোনও মাল তোমাদের নিকট থেকে গৃহীত হবে না।" অর্থাৎ তোমরা তোমাদের গোনাহর বিনিময় হিসাবে ধন-সম্পদ দিয়েও (শাস্তির কবল থেকে) নিজেদেরকে ছাড়াতে পারবে না। আরও

একটি আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'যদি পাহাড়-পর্বত সম স্বর্ণও পেশ কর, তবুও গৃহীত হবে না।" এ থেকে দু'টি কথা উদভাসিত হয়। প্রথমটি হলো এই যে, মরণের পর তো মানুষ পার্থিব জগতকে পিছনে ছেড়ে যায়। এখান থেকে কোন কিছুই সেখানে স্থানান্তরিত হতে পারে না। সেজন্য সওদাবাজী অথবা অন্য কিছু পেশ করার কোন প্রশ্নই উঠে না। দ্বিতীয়তঃ কুরআন শরীফ বলে যে 'ইওমুদ দীন' (বিচার-দিবস) তো হলো এমন একটি দিন - يوم لا تملك نفس لنفس شيئا و الامر يومئذ لله —যখন সমগ্র বিশ্ব-জগৎ, সকল প্রকারের মালিকানা সত্ব সম্পূর্ণরূপে (সর্বময়) মালিকের (খোদাতায়ালা) দিকে ফিরে যাবে। কোন ব্যক্তি নিজ সত্বার জন্যও কোন জিনিষের মালিক থাকবে না এবং অন্য কারো জন্যও মালিক হবে না। তারপর (এমতাবস্থায়) সওদাবাজী অথবা বিনিময় বা প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি সম্বন্ধীয় সকল কথাই দৃশ্যতঃ সম্পর্কহীন বলে প্রতীয়মান হয়। কাজেই অনিবার্যভাবে আয়াতটির বাস্তবতা ভিত্তিক এমন কোন অর্থ আছে, যা (সঙ্গত-ভাবে) প্রযোজ্য হয়, এবং সে অর্থটি অনুধাবন করা ব্যতিরেকে ঐ বিষয়-বস্তুটির যথার্থ হক আদায় হতেই পারে না, যে বিষয়টিরদিকে আল্লাহতায়ালা দৃষ্টি আকর্ষণ করাচ্ছেন।

মালী কোরবানীতে তাকওয়ার অসাধারণ গুরুত্ব:

হুজুর (আইঃ) বলেন, দুনিয়াতে দু'প্রকারের মালী কোরবানী পেশ করা যেতে পারে। প্রথম, যে মালী কোরবানী ঐকান্তিকভাবে আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্যে পেশ করা হয় এবং তাকওয়া ভিত্তিক হয়ে থাকে। এর সম্পর্কে এলাহী কানুন এই যে, স্বল্প পরিমাণ হলেও খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে গণাতীত হিসেবে গৃহীত হবে। দ্বিতীয়তঃ, যে মালী কোরবানী লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে অথবা অন্যান্য লক্ষ্য ও স্বার্থের খাতিরে করা হয়। উহা পাহাড়-পর্বতের সমান হলেও গৃহীত হবে না এবং রদ করা হবে। উল্লিখিত আয়াতে এ বিষয়-বস্তুটির দিকেই ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ (শেষোক্ত ধারায় মালী কোরবানী-কারীকে বলা হয়েছে যে) এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ো না যে তুমি স্বর্ণের পাহাড় সমান অর্থ তাঁর পথে দান করেছিলে। (কেননা) কোন লোকদেখানো ভাব অথবা তাকওয়ার দুর্বলতা কিম্বা অন্য কোন প্রচ্ছন্ন গোনাহর কারণে খোদাতায়ালার নিকট সে মাল দুনিয়াতে যদি কবুল না হয়ে থাকে, তাহলে আখেরাতেও তোমার হিস্‌সায় কোন কিছুই লিখা হবে না, এবং তখন তোমার এই আব-দার যে আমি তো খোদার পথে এত স্বর্ণ দান করে ছিলাম, এত ধন-ভাণ্ডার বিলিয়ে ছিলাম—এরূপ আপত্তি, এরূপ ধারণা এতটুকু সত্যতাও বহন করবে না। তখন খোদাতায়ালার সামনে এ উদ্দেশ্যে নিজের মালী কোরবানীকে পেশ করা যে, আমার অমুক গোনাহর বিনিময়ে ঐ সকল কোরবানী কবুল করুন এবং আমাকে ক্ষমা করে দিন—এরূপ খেয়াল, এরূপ অলীক ধরনা রদ করে দেয়া হবে। উল্লেখিত আয়াতটির একটি অর্থ তো হলো এই।

মৃত্যুর পর সন্তানদের মালী কোরবানী কি মা-বাপকে ফায়েদা পেঁছাতে পারে ?

হুজুর (আইঃ) বলেন, এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে এই যে, মৃত্যুর পর যখন 'দারুল-আমল' (কর্মক্ষেত্র—ইহজগত) থেকে মানুষের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তখন অধিকাংশ অবস্থায়, যে কোরবানী সে ইহজগতে নিজে করে নাই তা তার পক্ষ থেকে অন্যে পেশ করতে পারে না। এ বিষয়বস্তুটি 'আসদাকুস সাদেকীন' (সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী) হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। একবার তাঁর খেদমতে প্রশ্ন করা হয় যে, হে রসুলুল্লাহ! আমার মা যখন জীবিত ছিলেন, তখন তিনি আল্লাহর পথে এই এই প্রকারের খরচ করার বাসনা পোষণ করতেন, অর্থাৎ মানত রেখেছিলেন। কিন্তু উক্ত বাসনা পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। এখন এ কি সম্ভব যে, আমি সে বাসনা তাঁর মৃত্যুর পর পূর্ণ করি এবং তাঁর নামে সদকা-খয়রাত করতে থাকি। হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন যে, "ইহা সম্ভব ও সঙ্গত, তুমি অনুরূপ করতে পার।' তেমনি আরও বিভিন্নরূপে উক্ত রেওয়ায়েত (হাদিস)-টি বর্ণিত হয়েছে। এরদ্বারা নিশ্চিতরূপে এ কথাটি সামনে আসে যে, মানুষ তার জীবনে যে নেকী পালন করে থাকে, বিশেষতঃ মালী কোরবানী এবং তাতে তার আফসোস বা স্বাদ মিটে নাই বরং সে আরও দিতে ইচ্ছুক ছিল.....এরূপ ব্যক্তির সন্তানেরা (তার মৃত্যুর পর) যখন তার নামে তার পক্ষথেকে দান করবে, তখন আল্লাহতায়ালা (উহার সওয়াব ও পুরস্কার) তাকে (মৃতব্যক্তিকে) পেঁছাবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি দুনিয়াতে চাঁদা অনাদায়কারী ছিল, দুনিয়াতে সে খোদাতায়ালার মাল খেয়েছে (অর্থাৎ নির্ধারিত মালী কোরবানী করে নাই,)—অথবা মানুষের মাল আত্মস্যাৎ করেছে, সে ব্যক্তি মারা গেলে তার সন্তানদের মনে যদি এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, তার পক্ষ থেকে কোটি কোটি টাকা দান করে খোদাতায়ালার নিকট থেকে তাকে শাস্তি মুক্ত করে নিবো, তাহ'লে এটা শুধু একটা অলিক কল্পনা বই আর কিছুই নয়। ঐ সকল আয়াত যে-গুলির অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু আমি বর্ণনা করেছি সেগুলি তার সম্মুখে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়াবে।

মালী কোরবানীর শ্রীবর্ধনের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ নিগূঢ় তত্ব বা উপায়ঃ

হুজুর বলেন, উল্লিখিত আয়াতটির বিষয়বস্তু এমনি ধারায় অনুধাবন করার পর আমাদের চাঁদা-গুলিকে সুশোভিত করে তোলার উদ্দেশ্যে দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গূঢ়তত্ব বা উপায় আমাদের হস্তগত হচ্ছেঃ—

প্রথম, আমাদের নফ্‌স, আমাদের মন-মস্তিষ্ককে ভালরূপে স্খালন করে, গায়ের আল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য সকল প্রকারের বাসনা-কামনা, ব্যক্তি বা বস্তু) থেকে মুক্ত ও পবিত্র করে, নিজেদের মাল (অর্থাৎ আর্থিক কোরবানী) খোদাতায়ালার হুজুরে যেন পেশ করি, কোন প্রকারের ধোকা বা ছলনা যেন বিদ্যমান না থাকে। তাকওয়া বিবর্জিত কোন কিছু যেন উহাতে না থাকে। কেবল অর্থদানই যথেষ্ট নয়। মালকে পবিত্র হৃদয় ও পাক-নিয়তের সহিত দান করাও জরুরী। এবং আপনারা যদি এই প্রকারের নেকী করেন বা অবিরতভাবে পালন করতে গিয়ে সেগুলির '(পূর্ণ স্বাদ না মিটার)' আফসোস নিয়ে উঠে যান, সে সকল নেকী যদি আপনাদের সন্তানেরা এই নিয়তের সহিত জারী রাখে যে, "আমাদের মাতা-পিতার অন্তরে এগুলি আরও পালন করার আক্ষেপ থেকে গিয়েছিল, তাহ'লে কিয়ামতকাল অবধি ঐ সকল ধন-ভান্ডার আপনাদের জন্য পুঞ্জীভূত হ'য়ে গড়ে উঠতে থাকবে। হুজুর বলেন যে, এ দু'টি পথনির্দেশক নীতিকে অনুসরণ করে আমাদের মালী (আর্থিক) বিষয়াদির সহিত জড়িত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত

বিষয়াদিরও স্খালন করতে হবে এবং এ দুটি নীতিকে অনুসরণ করেই নিজেদের মাল (আল্লাহ্‌র পথে) পেশ করতে হবে।

ওসিয়তকারীদের উদ্দেশ্যে বিশেষ এরশাদ ঃ

হুজুর (আইঃ) অত্র খোৎবায় বিশেষতঃ নেযামে-ওসিয়ত সম্পর্কিত বিভিন্ন মালী বিষয়াদির উল্লেখ করে বলেন যে, কোন কোন লোক তাকওয়ার মার্গ থেকে স্খলিত হয়ে কোন কোন আইন-কানুনের (মার-প্যাচের) সূত্র ধরে ফায়েদা উঠাবার চেষ্টা করেন। আলোচনার বিষয় এ নয় যে, মাল কে দিয়েছে অথবা কতটা দিয়েছে। আলোচ্য বিষয় শুধু এটুকুই যে, যা-কিছু সে দিয়েছে, তার পিছনে তাকওয়ার রূহ বা চেতনা ছিল কি না। সেজন্য আমি ওসিয়তকারীদেরকে উপদেশ দান করছি যে এখনও জীবন থাকতে খোদাতায়ালার সহিত নিজেদের মোয়ামেলা দুরস্ত ও ঠিক করে নেয়ার সময় ও সুযোগ রয়েছে। যদি এই যুগটিতেও আপনারা নিজেদের মোয়ামেলা সুধরিয়ে না নেন, কিম্বা (মালী কোরবানীর ক্ষেত্রে) কোন কোন বিষয় গোপন রাখেন, অথবা কোন দিক থেকেও যদি আপনারা তাকওয়ার মানে উত্তীর্ণ না হন, তা'হ'লে নিজেদের মন থেকে এ-ধারণাটি বের করে দিন যে, কিয়ামতের দিন আপনারা নিজেদের দুর্বলতা ও ভুল-ত্রুটি সমূহের বিনিময় হিসেবে ইহজগতের মালী কোরবানীসমূহকে পেশ করবেন। এখানকার খাতায় যা-খুশী লিখা থাকুক, ওসিয়ত-দপ্তরের খাতা সেখানে স্থানান্তরিত হবে না। সেখানে তো 'কিরামান-কাতেবীন" -এর খাতা ভিন্নতর রয়েছে। তারা (অর্থাৎ ফেরেস্তাগণ) আল্লাহতায়ালা থেকে এ গূঢ়-তত্বটিই শিখে-ছেন যে, কার কোরবানীকে, যার পিছনে তাকওয়ার রূহ সক্রিয় ছিল, কতটা বাড়িয়ে লিখতে হবে এবং কার কোরবানীকে কতটা কম করে লিখতে হবে অথবা উহার অস্তিত্বই সম্পূর্ণ নস্যাৎ ও বিলপ্ত করে দিতে হবে।

হুজুর (আইঃ) ওসিয়তের মালী দিকগুলির সহিত জড়িত বিভিন্ন ত্রুটি ও খারাপিসমূহ চিহ্নিত করে উদাহরণের দ্বারা সেগুলি স্পষ্ট করে তুলে ধরেন এবং বলেন যে, কোন কোন লোক দুনিয়ার আইন-কানুন দ্বারা ফায়েদা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাকওয়ার মানদন্ড থেকে সরে যান। কিন্তু খোদাতায়ালার কানুনকে ধোকা দেয়া যায় না। উহা দুনিয়ার কানুনের অধীন নয়। উহার প্রয়োগ ভিন্নতর হবে। সেজন্য এরূপ লোকেরা —যখন তাদের কোন কোন ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয়ে পড়ে তখন, তারা এই ওজর পেশ করেন যে, "আচ্ছা, জনাব! এখন আমরা নিজেদের বকেয়া দিতে প্রস্তুত।" অথবা কেউ কেউ যারা কম সম্পত্তি লিখিয়ে থাকেন এবং পরে যখন গোপনকৃত সম্পত্তি সম্বন্ধে জানা যায়, তখন (তাদের মৃত্যুর পর তাদের সন্তানরা বলে, আচ্ছা, আমরা সে সম্পত্তির উপরও (বকেয়া চাঁদা) দিয়ে দিচ্ছি।" এখন ওসিয়ত-সংস্থার কর্তৃপক্ষ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত ওসিয়ত সংক্রান্ত নিযামের উপর জুলুম করবেন যদি ঐ ধরণের এক কোটি টাকাও উসল করে ওসিয়ত বহাল করে। কেননা যদি ইহা প্রমাণ হয়ে যায় যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করেছিল, তা'হলে সে তাকওয়ার ঐ মানদন্ড যার ভিত্তিতেও নিয়ত কবুল হয় তা থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছে, তারপর এমন আর কোন কথাই থাকতে পারে না, যে কত টাকা তার সন্তানেরা দিতে প্রস্তুত। যদি ইহা প্রমানিত হয় যে, কোন ব্যক্তি তার জীবনে মালী কোরবানী সংক্রান্ত ব্যাপারে খোদাতায়ালার সহিত বদ-দেয়ানাত (অসততা) করছিল, আল্লাহতায়ালা যা তাকে দিয়েছিলেন, তা গোপন করছিল, তা কম করে দেখাচ্ছিল, এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ফিরতির সময় তো আর এ তর্কের কোন অবকাশ নেই যে, সে কত দিয়েছিল বা দেয় নাই। তার ওসিয়ত মনসুখ (Cancel) হওয়া উচিত।

হুজুর (আইঃ) বলেন, এরূপ ব্যক্তিদের ওসিয়ত যখন মনসুখ (বাতিল) করা হয়, তখন আবার শোর-গোল উঠে যে, "বড়ই জুলুম করা হচ্ছে জামাতে, আজীবন সে (আল্লাহর রাস্তায়) এত দিয়েছে। তার অমুক একটি সম্পত্তি ছিল, এখন সেটার জন্য এত সব ঝগড়া দাঁড় করানো হয়েছে।" বস্তুতঃ এই বদ-দিয়ানতি (অসততা) একে তো এই দুনিয়াতেই ক্ষতির কারণ হয়ে গেলো যে সে তার

সন্তানদেরকে নষ্টের পথে ঠেলে দিল আবার আত্মীয়স্বজনদের ঈমান ও ধ্বংস করলো। অতএব, তাকওয়া এখতিয়ার করুন এবং প্রতিটি দ্বীনি ক্ষতি থেকে নিজেদেরকে করে চলুন।

নেযামে-ওসিয়্যতের ব্যবস্থাপকদের প্রতি বিশেষ হেদায়েত ঃ

হুজুর (আইঃ) জামাতের নেযামকেও তাকওয়ার ঐ সকল মানদণ্ডের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখার এবং এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য নসিহত করেন। এবং বলেন যে, যে নেযাম ধনীদের সহিত ভিন্ন ব্যবহার করে এবং গরীবদের সহিত ভিন্নতর ব্যবস্থা করে, সে নেযাম রুহানী ও এলাহী নেযাম হতে পারে না। সেজন্য নেযামে-জামাতের একটি মাত্র চোখই রয়েছে এবং তা হলো তাকওয়ার চোখ। তাকওয়ার চোখ এ পার্থক্য করতেই পারে না যদি কিনা উহার মধ্যে ত্রুটির সৃষ্টি না হয়ে গিয়ে থাকে। কাজেই নেযামে-জামাত তো এখন প্রত্যেকের সাথে ঐ ব্যবহারই করবে যে ব্যবহার খোদাতায়ালার পবিত্র কালাম আমাদের নিকট চায় অর্থাৎ একই রকম ব্যবহার যেন করা হয়। (তাতে) যদি কেউ হোঁচট খায়, তা'হলে আমি তার জন্য জিম্মাদার (দায়ী) নই, (তার জন্য) প্রথমতঃ 'নফ্‌সে'র সেই কীট জিম্মাদার, যা তার কোরবানী সমূহকে ধ্বংস করেছে এবং সে উহার (প্রতিকারের) কোন চিন্তা করে নাই। যদি কারো ছেলে-মেয়েদের হোঁচট লাগে, তা'হলে তার জন্য আমি জিম্মাদার নই। কেননা জিম্মাদার হলো খোদাতায়ালার কালাম, যার অধীনে আমি এক নগণ্য দাসের চেয়েও তুচ্ছতর মর্যাদা রাখি এবং নেযামে জামাতেরও উহার মোকাবিলায় কোন মর্যাদা নেই—এরা সব এখতিয়ার বিহীন লোক। সেজন্য খোদার কালাম জারী হবে এবং অনিবার্যভাবে জারী হবে। ঐ সব লোক যারা নফ্‌সের বড়াই, ব্যক্তিগত অহংকার, অথবা নিজেদের দুনিয়াবী ঐশ্বর্য্যের বড়াই নিয়ে ফিরে, তারা যেন আত্মপ্রতারণায় পড়ে না থাকে। ইহা এজন্যই করা হচ্ছে যাতে আপনারা রক্ষা পান। আপনাদেরকে ক্ষতি সাধনের উদ্দেশে ইহা করা হচ্ছে না। ইহা এজন্য করা হচ্ছে যাতে ইহজগতে আপনারা জানতে পারেন যে, আপনারা কি করেছেন, পাছে মৃত্যুর পর এ ধ্বনি উত্থিত হও যে, আজতো সওদা করার দিন নয়, আজ তো কোন সুপারিশ কাজে আসবে না, আজতো কোন প্রকারের বন্ধুত্ব তোমাদের ফায়েদা পৌঁছাতে পারবে না। সে জন্য 'নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক' এ সব কোন শত্রুতার কথা নয়, অথবা কোন রুঢ়তার কথা নয়। এর চেয়ে উত্তম আপনাদের সপক্ষে অর্থাৎ আহ্‌বাবে-জামাতের সপক্ষে নেযামে জামাত আর কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারে না। কাজেই নেযামে-জামাতের দৃষ্টি পড়ে এবং আপনাদেরকে পাকড়াও করে, এর কম ঘটার পরিবর্তে নিজেরাই নিজেদের আত্মপরীক্ষা ও আত্মপর্যালোচনা করুন এবং তাকওয়ার নূন্যতম মানে হলেও উত্তীর্ণ হোন।

হুজুর (আইঃ) মাল এবং তাকওয়া সম্পর্কিত বিষয়বস্তুটির সম্বন্ধে বলেন যে, এ প্রসঙ্গে আরও কোন কোন দিকের উপর আগামী খোৎবায় আলোকপাত করা হবে।

"ভারতে গৃহ-সম্প্রসারণ ফাণ্ড" সম্পর্কিত তাহ্‌রীক ঃ

হুজুর (আইঃ) খোৎবার শেষ দিকে একটি জরুরী বিষয়ের দিকে জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সে বিষয়টি হলো ভারতে জামাতের কোন কোন মালী জরুরত সম্বন্ধে। হুজুর বলেন যে, ইতিপূর্বে ভারতে মালী কোরবানীকারী কোন কোন বিশিষ্ট বন্ধু মওজুদ ছিলেন। কিন্তু একজন বা দু'জন অথবা গুটি কয়েকজন মানুষের কোরবানীর দ্বারা জামাতের কোরবানী সম্পর্কিত কর্তব্য সম্পন্ন হয় না। এবং শুধু প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যাওয়া—কোরবাণীর এহেন অর্থ হলো দুনিয়াবী অর্থ। কোরবানীর যথার্থ দ্বীনি অর্থ হলো, কোরবানীর জন্য অন্তঃকরণ যেন পাক ও পবিত্র হয় এবং খোদাতায়ালার নিকট তার মর্তবা উঁচু হয়। সুতরাং গোটা ও সমগ্র জামাত যদি কোরবানীতে শামিল না হয় অথবা কোরবানীর মানোন্নয়নে কর্তব্য-রত না থাকে, তাহ'লে সাধারণভাবে জামাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে ভারতের জামাতী প্রয়োজনসমূহ অত্যন্ত দ্রুত বেড়ে চলেছে। জামাতের সংখ্যাও বেশ বেড়েছে এবং খোদাতায়ালার ফজলে তাদের অর্থ-সম্পদেও বরকত হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও ভারতের জামাত আর্থিক (কোরবানীর) দিক দিয়ে এখনও নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে নাই। এখন জামাতের দিক থেকে তাৎক্ষণিক যে প্রয়োজন সমূহ সামনে এসে পড়েছে সেগুলোর মধ্যে করেছে 'মোকামাতে-মুকাদ্দসা (ধর্মীয় পবিত্র-স্থানসমূহ)-এর জরুরী ভিত্তিক মেরামত। তেমনিভাবে দিল্লীতে জামাতের শানদার কেন্দ্র স্থাপন হতে চলেছে। কানপুরে জামাতের একটি কেন্দ্রের দরকার এবং আরও অনেকগুলি প্রয়োজন রয়েছে। আমার ধারণানুযায়ী ৪০/৫০ লাখের মত টাকার প্রয়োজন। কিন্তু আমি ফয়সালা করেছি যে, ভারতের জামাতসমূহকে স্বনির্ভরশীল করে তোলার জন্য জরুরী যে, ভারতের বাইরে যেন সাধারণভাবে তাহরীক না করা হয়। এ প্রসঙ্গে হুজুর (আইঃ) তিনটি পন্থা বর্ণনা করে ইরশাদ করেনি যে, সেগুলিকে সামনে রেখে তদনুযায়ী যাঁরা আর্থিক (কারবানী পেশ করতে চান কেবল তাঁরাই পেশ করুন। প্রথমটিতো এই যে, ভারতের জামাতসমূহ নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াতে চেষ্টিত হোন এবং বিগত ত্রুটির বিচ্যুতি ও গাফলতির জন্য (আল্লহর নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কোরবানীর মানোন্নয়ন দুনিয়ার অন্যান্য জামাতসমূহের সাথে একযোগে চলার জন্য বদ্ধপরিকর হোন। যদি সংকল্প গ্রহণ করেন, দোওয়া করেন, তা'হলে আল্লাহতায়ালা তওফিক দান করবেন।

হুজুর (আঃ) বলেন, আমি জানি যে, ভারতের জামাতগুলিতে এর সামর্থ্য ও তওফিক রয়েছে—তারা ইচ্ছা করলে অতি সহজেই এ যৎসামান্য অংকের টাকা পূরণ করতে পারেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারতের জামাতসমূহের সহিত সম্পর্কযুক্ত ঐ সকল লোক রয়েছেন যারা (ভারতের) বাইরে যেমন—আমেরিকা, ইউরোপ, এবং অন্যান্য দেশে চলে গিয়েছেন (এবং ঐ সব দেশে বসবাস করছেন)। তাঁদের আর্থিক অবস্থা খোদাতায়ালার ফজলে অনেক বদলে গেছে। যদি তারা সকলে ইচ্ছা করেন তা'হলে ৪০ লক্ষ কেন অন্যান্য সকল চাঁদা ছাড়াও কোটি কোটি টাকা পেশ করতে পারেন। আমি আহ্বান জানাচ্ছি ভারতীয় প্রবাসী আহ্‌মদীদের নিকট, তাঁরা যেন এই মালী কোরবানীতে এগিয়ে আসেন।

তৃতীয় পর্যায়ে আমি এ ঘোষণা করছি যে, যদি কোন আহমদী ব্যক্তিগতভাবে নিজের এই হক দাবী করে, যে "কাদিয়ানের সম্পর্ক যেহেতু জগৎব্যাপী সকল জামাতের সহিত, অতএব, আমাদেরও সে হক বর্তায়। কাজেই আমরা আমাদের আন্তরিক আবেগানুভূতির তাড়নায় বাধ্য হয়ে এই হক কামনা করছি যেন আমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়।" —তা'হলে এমতাবস্থায় ঐরূপ ব্যক্তিদের কোরবানী রদ করা হবে না। কোন জামাতের পক্ষে এইরূপ মনে করার অধিকার নেই যে, যেহেতু সাধারণভাবে তাহরীক করা হয় নাই সেজন্য উল্লিখিত লোকদের নিকট থেকে চাঁদা গ্রহণ করা যাবে না।

হুজুর বলেন, উক্ত তিন নীতির অধীনে আমি এ তাহরিকটির ঘোষণা করি যে, ভারতের (জামাতী) প্রয়োজনসমূহ এবং তাৎক্ষণিক জরুরী প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে জামাতের

কমপক্ষে ৪০ লক্ষ টাকা (রুপিয়া) সংগ্রহ করা উচিত। আর সেই সঙ্গে আপনাদেরকে এ নিশ্চিত প্রত্যয় দিচ্ছি যে, প্রয়োজনসমূহ অবশ্য অবশ্যই পূর্ণ হবে। প্রথমতঃ, ইনশাআল্লাহ আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যেমন আজ পর্যন্ত সর্বদা আল্লাহতায়ালা এ ব্যবহারই করে আসছেন যে, অসঙ্গতি ও শত অসুবিধা সত্ত্বেও, প্রত্যেক প্রকারের বিরূপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়েও জামাত মালী কোরবানীসমূহের ময়দানে এরূপ উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করেছে, যা দেখে মানুষ হতভম্ব ও বিস্ময়াবাক হয়ে পড়ে, বিশ্বাস হয় না যে, যে সব মানুষের জেব দৃশ্যতঃ খালি করে দেয়া হয়েছিল সেগুলি থেকে পুনরায় আল্লাহতায়ালা এ সকল ধন-ভাণ্ডার সৃষ্টি করে দিলেন। মোট-কথা, এ সব খোদা-তায়ালার কাজ, তিনি নিজে সমাধা করবেন।

হুজুর (আইঃ) বলেন, বাধ্যবাধকতা ও অপারগতা বশতঃ যদি উক্ত অংক পূর্ণ না হয়, তাহ'লে তাহরীকে-জাদীদ আজুমানে আহমদীয়া (রাবওয়া) এবং সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, (রাবওয়া) অবশিষ্ট এই প্রয়োজন অনায়াসে পূরণ করে দিবে। এর জন্য আমি জামিন, ইনশাআল্লাহুতায়ালা। সেজন্য কাদিয়ানওয়ালাগণ সে অনুযায়ী নিজেদের প্রোগ্রাম তৈরী করুন, তাঁরা তাঁদের সম্পূর্ণ প্রয়োজনসমূহকে সুনির্দিষ্ট করুন এবং অতিদ্রুতবেগে সেগুলিকে বাস্তবায়িত করার দিকে মনোযোগী হোন। আল্লাহ-তায়ালা স্বীয় ফজলের দ্বারা প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে দিবেন।

সাহীওয়াল ও শুক্কুরের নির্যাতিতদের প্রসঙ্গে ইরশাদ :

খোৎবা সানিয়ার মধ্যে হুজুর (আইঃ) সাহিওয়াল এবং শুক্কুরের নির্যাতিত-নিপীড়িতদের সম্পর্কে বলেন যে, বিগত খোৎবাগুলিতে যখন তাদের বিষয়ে উল্লেখ করা হয় এবং জামাতের আবেগানুভূতি তাদের নিকট পেঁৗছানো হয়, তখন তাঁরা পয়গাম পাঠিয়েছেন যে, "জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে আমাদের 'আস্-সালামু আলাইকুম' পেঁৗছিয়ে দিন এবং নিশ্চয়তা দান করুন যে, আমরা আল্লাহতায়ালার ফজলে অত্যন্ত আনন্দিত আছি। এবং (নিজেদের জন্য ইহাকে) আমরা অসাধারণ সৌভাগ্য বলে জ্ঞান করছি। কাজেই আমাদের প্রতি দয়ার্দ্র হবেন না। শুধু দোওয়া করুন এবং আমাদের পক্ষ থেকে বাহিরের সকলকে তসল্লি ও শান্তনা দিন, তাঁরা যেন আমাদের ব্যাপারে কোনই চিন্তা না করেন।

হুজুর (আইঃ) বলেন, এ পয়গামতো ঠিকই বটে, কিন্তু চিন্তা কি করে না করি? ইহা এমন কোন জিনিস নয় যে, কাউকে 'চিন্তা করো না' বলাতে চিন্তা দূর হয়ে যেতে পারে! তাদের এটাই কর্তব্য ছিল। তাদেরকে খোদাতায়ালা এ সৌভাগ্য প্রদান করেছেন। এটাই তাদের মর্যাদা ও শানোপযোগী ছিল। সে পয়গাম আমরা পেয়েছি। কিন্তু আমরা নিজস্বভাবে খোদাতায়ালার দেওয়া তওফিক ও সামর্থানুযায়ী তাদের জন্য যা করণীয় তা অবশ্য করবো। দোওয়াও করবো। তারা হলো সমগ্র জামাতের পক্ষ থেকে 'ফরজে-কেফায়া' আদায়কারী ব্যক্তিবর্গ। সমগ্র জামাতের শাহাদাতের রুহ বা আত্মচেতনা-বোধ সঞ্জীবনকারী ব্যক্তিবর্গ। সেজন্য তাদেরকেতো অন্তর থেকে সরিয়ে দেয়া যায় না।

খোৎবা সানীয়া সম্পূর্ণ করার পর হুজুর জুম্‌য়ার নামায পড়ান।

(লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আল-নস্‌র' ১১ই এপ্রিল '৮৬ইং)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

সুলতানুল কলম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-র গ্রন্থ-পরিচিতি

"অসীর কর্ম আমি মসীতেই সাধিয়াছি।"

—'দুররে সমীন'

[সাম্প্রতিক কালে বিশেষ একটি মহল কতিপয় পত্রিকায় আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর রচিত গ্রন্থাবলী থেকে 'কাট-ছাঁট' করে উদ্ধৃতি দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

অতএব, আমরা সভ্য-জগতের হাতিয়ার 'কলম' হস্তে প্রেরিত সুলতানুল কলম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) রচিত গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাঠকদের জ্ঞাতার্থে পেশ করছি। আশা করি, পাঠকবর্গ এই পরিচিতি পাঠে লিখনি-সম্রাটের 'ক্ষুরধার লিখনি' ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় কতখানি কার্যকরী অবদান রেখেছে তাহা হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম হবেন।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৮)

(১৩) আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম
(ইসলামের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠতার মনোহর দর্পন)

'আয়নায়ে কামালতেতে ইসলাম' গ্রন্থটির দুটি অংশ রয়েছে। একটি অংশ উর্দু ভাষায় লিখিত এবং অপর অংশটি আরবীতে। উর্দু অংশটি ১৮৯২ইং সনে ও আরবী অংশটি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রকাশিত হয়।

পুস্তকটির আরও একটি নাম আছে। আর তা হল—'দাফেউল ওয়াসাওয়েস' অর্থাৎ সন্দেহ সংশয় দূরীকরণ। আরবী অংশটিকে 'আল-তবলীগ' (অর্থাৎ সত্য-বাণী প্রচার) শিরোনাম দেয়া হয়েছে।

গ্রন্থটির সূচনাতে হযরত আহমদ (আঃ) তাঁর লিখিত পূর্ববর্তী কয়েকটি গ্রন্থ ফাত্হে ইসলাম, তৌজিহে মারাম ও ইজালায়ে আপহাম ইত্যাদির নাম উল্লেখ করে মুসলমানগণকে আল্লাহতায়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া আদায় করতে বলেন, কেননা মুসলমান উম্মাহর এই ক্রান্তি লগ্নে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে অমুসলিমদের আরোপিত অপবাদ ও অভিযোগসমূহের সমুচিত জবাবদানের জন্য এবং ইসলামের মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তাদের মধ্য থেকে একজনকে মহান আল্লাহতায়ালা আপন ফজলে সামর্থ দান করেছেন, আল-হামদুলিল্লাহ! আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহরাজীর প্রবল বারিধারা ইসলামের একনিষ্ঠ এই প্রেমিককে আধ্যাত্মিকতার প্রসঙ্গে লালন পালন করে উন্নততর রূহানী পদ-মর্যাদা মসীহ মাওউদ (আঃ) অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহরূপে অভিষিক্ত করায় কৃতজ্ঞতাবোধের প্রকাশ যা কিনা ছিল যুক্তি ও ন্যায়সংগত তার পরিপর্ত্তে চরম বিরোধীতার কর্কশ—জালেমানা আওয়াজ উত্থিত হোল। অন্যায়ভাবে সর্বপ্রকার বিকৃত নামে তাকে আখ্যায়িত করা হোল আর

এই অন্যায় জালেমানা কার্যক্রমের মূল হোতা হলেন মৌলবী মোহাম্মদ হোসাইন বাটালবী এবং কুফরী ফতোয়া প্রদানকারী স্বাক্ষরদাতাদের পুরোভাগে রইলেন তার ওস্তাদ মিয়া নাজির হোসাইন। হযরত আহমদ (আঃ) জানান যে, তাদের এই বিরূপ আচরণে তিনি আশ্চার্যান্বিত হোননি কারণ সর্বকালেই বুজুর্গ অলিআল্লাহগণের সাথে এহেন ব্যবহারই করা হয়েছে। তবে সামান্য সময়ের ব্যবধান ও কালের পরীক্ষা উত্তরণের পরেই তাদের প্রকৃত মর্যাদা স্বীকৃত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে হযরত আহমদ (আঃ) আরও জানান যে এ ধরণের কুফরী ফতওয়ায় তিনি কোনরূপ মনকষ্ট পাননি কেননা আল্লাহতায়ালা তার পবিত্র দ্বীনের খেদমতে তাঁকে মনোনীত করেছেন এবং তিনি পবিত্রতম রসুল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-র মহান সুউচ্চ মর্যাদা এবং পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করবেন।

এবং গ্রন্থ রচনার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি পাঠকদের অবগত করান যে, একধারে খৃষ্টধর্ম প্রচায়কগণ ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করে ইসলামের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানছে অপরদিকে মুসলমানগণ ইউরোপীয় ভাবধারা ও দর্শনে প্রভাবান্বিত হয়ে ইসলামকে এমন বিকৃতরূপে পেশ করছে যে, অমুসলিমরা ইসলামের অব্যবহারিক ও অবান্তর চেহারা দর্শনে ইসলামের প্রতিই বীতশ্রদ্ধ ও পরিণামে ধর্ম বিমুখ হয়ে উঠছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি ওহী, ইলহাম, ফেরেশতা, নবুওয়ত ইত্যাদি বিষয়ে স্যার সৈয়দ আহমদ সাহেবের ভ্রান্ত ধারণার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে এরূপ মনগড়া ধারণা প্রকারান্তরে ইসলামকেই আক্রান্ত করে। অতএব হযরত আহমদ (আঃ) ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য, মহানুভব শিক্ষা ও সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠাকল্পে ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সমুন্নত রাখতে এবং ইহার অন্যান্য ও অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত সমুজ্জ্বল চেহারা বিকশিত করার মহান অনুপ্রেরণায় এগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে বর্ণিত ওহী-ইলহামের স্বরূপ, ফেরেশতার অবতরণ ও ইলহামের অন্যান্য বৈশিষ্টসমূহ ইত্যাদি বিষয়। আধুনিক দর্শনে প্রভাবিত ইসলামের মহান পবিত্র শিক্ষা ও নীতিমালায় বিরোধিতায় যাদের কপালে কুঞ্চিত রেখা দেখা দেয় তাদের আপত্তি সমূহের যথাযথ খণ্ডন এ গ্রন্থে করা হয়েছে। তিনি ব্যাপক যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করে যীশুখৃষ্ট হযরত ঈসা (আঃ) বা অপরাপর নবীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ-সুউচ্চ মিনারে যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) অধিষ্ঠিত রয়েছেন তাহা উজ্জল সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমানরূপে দৃশ্যমান করান। হযরত ঈসা (আঃ)-কে বড় করে দেখানোর অপচেষ্টা করা হচ্ছে বলে তিনি এমনটি করেছেন তা নইলে আল্লাহতায়ালার অন্যতম প্রিয় নবী হযরত ঈসা (আঃ)-কে খাটো করার সামান্যতম অভিপ্রায়ও তিনি রাখেননা বরং তার যথোপযুক্ত মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করাও হযরত আহমদ (আঃ)-র উপর অন্যতম আরোপিত দায়িত্ব।

ইসলামের শাশ্বত সুন্দর মনোরম শিক্ষার বিশদ বিবরণ দিতে তিনি একজন সৎ-মুসলমানের বৈশিষ্টপূর্ণ গুণাবলীর পরিচয় দান করেন এবং এ সকল গুণাবলী তাকে কিরূপে উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠান করে তার প্রামাণিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এইরূপে তিনি ধর্ম

হিসাবে ইসলামের জীবন্ত চলমান ধারা সপ্রমাণিত করে মুসলমানগণকে এ নিশ্চিত প্রত্যয় দেন যে ইসলামের বিজয় অত্যাসন্ন।

ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করার নীতি, সমাজে শান্তি বজায় রাখা ও রাষ্ট্র পরিচালনায় আইন-শৃংখলার যথাযথ মূল্যায়ন এবং বিচার বিভাগের পক্ষপাতহীন ও ন্যায়বান শাসন ব্যবস্থার জন্য বৃটিশ সরকারের প্রশংসা করে হযরত আহমদ (আঃ) ইংল্যাণ্ডের রাণী যেন ইসলামের ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয়লাভের তৌফিক পায় তজ্জন্য দোওয়া করেন। তিনি ইংল্যাণ্ডের রাণীকে সম্বোধন করে খোলা পত্রের আকারে তার নিকট সবিস্তারে ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য এবং পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরে তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান।

"নূরে-আফশান" নামে একটি খৃষ্টান পত্রিকা তাদের ১৩ই অক্টোবর ১৮৯২ সংখ্যায় খৃষ্ট-ধর্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সদম্ভে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। উক্ত প্রবন্ধে লেখক ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ঘোষণা করে, যদাবধি আমাদের গ্রহে মনুষ্যের বাস তৎকাল যাবৎ এমন কেহ নাই যে, পুনরুত্থান বা পুনর্জীবন লাভের দাবী পেশ করতে পারে। আরও দাবী করতে পারে যে—যে কেহ তার প্রতি ঈমান আনয়ন করবে সে মৃত্যু থেকে পরিত্রান পাবে অর্থাৎ পাপ থেকে মুক্তি খোদাতায়ালার অবাধ্যতা থেকে বাঁচবে, ধর্ম-কার্যে অনীহা এবং ঈমানের শুষ্কতা হতে রক্ষা পেয়ে খোদাতায়ালার আনুগত্যে আধ্যাত্মিক জীবন লাভে ধন্য হবে। প্রবন্ধকার জানায় যে, উক্ত মহান গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের একমাত্র দাবীদার যীশু খৃষ্ট তথা হযরত ঈসা (আঃ) এবং তিনি তার এই দাবী প্রমাণিত করতেও সক্ষম। বাগাড়ম্বরের সাথে সে আরও লিখে যে, যদি কেহ তাঁর (হযরত ঈসা (আঃ) এই দাবী খণ্ডনে চেষ্টিত হয় তবে ব্যর্থ হবে ও তাঁর ন্যায় কোন মোজেজা প্রদর্শনে সক্ষম হবে না।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-র গোলাম হযরত আহমদ (আঃ) আলোচ্য গ্রন্থে প্রবন্ধকারের দাম্ভিকতাকে চূর্ণ করে বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করেন। তিনি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেন যে, যীশু যদি প্রকৃতই পুনরুত্থান ও পুনর্জীবন দাতা হতেন তাহলে একজন সত্য নবী হিসাবে তাঁর এই দাবী প্রমাণিত করাও জরুরী ছিল। তাঁর জীবদ্দশাতেও এই দাবী প্রমাণিত হওয়া উচিত এবং তাঁর তিরোধানের পরও এই রূহানী জীবনদান কর্মসূচী অব্যাহত থাকা উচিত। কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে তৌহীদের (খোদাতায়ালার একত্ব শিক্ষা দান প্রচার ও প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম তাঁর অবদান এতটা অনুল্লেখ্য যে সম্ভবতঃ অন্যান্য সকল নবীই এ বিষয়ে তাঁর অগ্রভাগে অবস্থান করছেন। যীশু খৃষ্ট (হযরত ঈসা আঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত কথিত মোজেজা সমূহের অসারতাও তিনি এই গ্রন্থে প্রমাণ করেন। যেমন—মৃতকে জীবন দান। তিনি যুক্তি আরোপ করেন যে, যীশু যদি প্রকৃতই ঐ সকল মোজেজা বা অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনের ক্ষমতা রাখতেন তবে তার অনুসারীদের কেহ এতটা মন্দ হোতনা যে তাদের একজন তাকে (যীশুকে) সামান্য টাকা উৎকোচের বিনিময়ে গ্রেফতার বরণ করাল এবং অন্য একজন 'যীশুকে' প্রশ্নের সম্মুখীন হলে অজ্ঞতার ভান করল।

হযরত আহমদ (আঃ) যীশুর সংগীদিগের সাথে হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-র সাহাবীগণের তুলনামূলক আলোচনা করে তাদের ব্যাপক পার্থক্য সুস্পষ্টাকারে প্রকাশ পাওয়ায় অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ও অকাট্যরূপে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-ই যে প্রকৃত জীবন দানকারী রসুল ছিলেন তাহা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

অতঃপর হযরত আহমদ (আঃ) মৌলভী, মুফতী ইত্যাদি যারা তাঁরে কাফের বলে আখ্যায়িত করে এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর মত পার্থক্য রাখে তাদেরকে তিনি দাবীর সত্যতা নিরূপণের জন্য খোদাতায়ালার নিকট দোওয়া কবুল করানোর বিষয়ে দ্বৈত-প্রতিযোগিতা গ্রহণের আহ্বান জানান। অনুরূপভাবে তিনি খৃষ্টান মিশনারী, হিন্দু, আর্যসমাজী, ব্রাহ্মণ, শিখ, প্রকৃতিবাদী ও নাস্তিকদিগকেও বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য আহ্বান জানান। এই সকল চ্যালেঞ্জ ও আমন্ত্রণের পর হযরত আহমদ (আঃ) যারা তাকে গ্রহণ করেছেন বা ভবিষ্যতে যারা গ্রহণ করবেন তাদের নিশ্চয়তা দান করেন যে তারা মোটেই ক্ষতিগ্রস্থ হবেন না বরং পরিণামে তারাই আশিষমণ্ডিত হবে।

পুস্তকটির দ্বিতীয় অংশ আরবী ভাষায় আল-তবলীগ' শিরোনামে হযরত আহমদ (আঃ) তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সাহাবী মৌলবী আবদুল করীম সাহেবের পরামর্শে লিখেন। মৌলবী আবদুল করীম সাহেব মুসলমান ধর্মীয় নেতা যারা ফকীর ও পীরজাদা নামে খ্যাত তাদের উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে পত্র লিখার পরামর্শ দেন। হযরত আহমদ (আঃ) পরামর্শটি খুবই পছন্দ করলেন এবং ইহাকে গ্রন্থটির অংশরূপে নির্ধারণ করে উর্দু ভাষায় লিখবেন বলে স্থির করেন; কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহতায়ালার তরফ থেকে ইঙ্গিত লাভ করায় তিনি উহা আরবীতে লিখেন। আরবী ভাষায় হযরত আহমদ (আঃ)-এর এটাই প্রথম লিখা।

এই অংশের প্রারম্ভে আরব, ভারত ও অন্যান্য দেশের সকল পীর, জাহিদ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সম্বোধন করে হযরত আহমদ (আঃ) ঘোষণা দান করেন যে, জগতে আচ্ছাদিত সকল শয়তানী শিকড়সমূহ উৎপাটন করতে আল্লাহতায়ালা তাকে দণ্ডায়মান করেছেন এবং এ বিষয়ে তিনি তাদের ইসলামী শরিয়তের গুরুত্ব উপলব্ধি করাতে শরীয়তের বহুবিধ হুকুম বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি তাদের ইহাও জানান যে তারা যেন তার প্রতি তাচ্ছিল্যতা ও অবজ্ঞার ভাব না দেখায়।

পাঠকদের নিকট তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর প্রমাণ করে তৎসঙ্গে ব্যক্ত করেন যে, সাধারণভাবেই এ বিষয়টি বোধগম্য হতে পারে না যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) ওফাত পেয়ে দাফন হলেন কিন্তু যীশু খৃষ্ট হযরত ঈসা (আঃ) অদ্যাবধি জীবিত রইলেন এমন কি স্বশরীরে স্বর্গারোহণ করলেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু প্রমাণ করতে তিনি উন্থটিতে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ব্যাপক উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যাদান করেছেন। তৎসঙ্গে তিনি শেষ জামানায় হযরত ঈসা মসী (আঃ)-র পুনরাগমনের প্রকৃত পদ্ধতি বর্ণনায় জানায় যে তিনি এ পৃথিবীতেই অপরাপর নবীদের ন্যায় জন্মগ্রহন করবেন—অবাস্তব ও অবাস্তব পন্থার অবকাশ থেকে নিক্ষিপ্ত হবেন না। এই আরবী অংশেও তিনি ইংল্যান্ডের রাণীকে ইসলাম গ্রহণ করতে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে কৃত অপরাধের জন্য অনুসূচনা করতে পরামর্শ দান করেন।

অতঃপর তিনি কতিপয় বুজুর্গরূহনী ভ্রাতার সাথে তাঁর যোগসূত্র এবং তাদের জীবন ইতিহাসের কিছু উল্লেখযোগ্যদিক আলোকপাত করেন। (ক্রমশঃ)

[Introducing the books of the Promised Messiah (P)—অবলম্বনে লিখিত]

— মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ

একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর-১২)

ইসলামের উন্নতির প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় মহা-যুগ ঃ

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলামের উন্নতির দুটি প্রধান পর্যায় বা যুগের ঐশী-প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এ দুটি পর্যায় হলো—(১) ধর্মের বিধি-ব্যবস্থায় পূর্ণতা (তকমীলে হেদায়েত) এবং (২) ধর্মের প্রচার-মূলক পূর্ণতা (তকমীলে এশায়েত)। এ সম্বন্ধে নীচে কয়েকটি বিষয়ে উল্লেখ করা হলো।

(ক) পবিত্র কোরআনের সূরা সাফে বর্ণিত হযরত ঈসা (আঃ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বানী সম্পর্কে বলা হয়েছে ; "ওয়া মুবাশশেরাম বে-রাসূলি ইয়াতি মিম বাদিসমুহু আহমদ" (আমি 'আহমদ' নামে একজন রসূলের সুসংবাদ দিচ্ছি যিনি আমার পর আগমন করবেন")

এই আয়াতে হযরত রসূল করিম (সাঃ)-এর অন্য একটি নাম অর্থাৎ 'আহমদ' সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা পবিত্র কুরআনের আর কোথাএ 'মুহাম্মদ' ব্যতীত 'আহমদ' নাম ব্যবহৃত হয় নাই। তিনি উভয় নামেই পরিচিত হলেও তাঁর প্রধান নাম (ইসমে আযম) হলো 'মুহাম্মদ' (সাঃ) এবং 'আহমদ' হলো তাঁর অন্যতম গুনবাচক নাম। যেমন বুখারী শরীফ হতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বলেছেন—"আমি আহমদ, মাহী ও আকেব।" বস্তুতঃ এগুলি তাঁর গুনবাচক (সিফাতি) নাম। হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপরোক্ত ভবিষ্যৎদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শুধু 'মুহাম্মদ' হবেন না, তিনি 'আহমদ' হিসেবেও আগমন করবেন। এই বিষয়টিরই সমর্থন পাওয়া যায় সূরা জুমার 'ওয়া আখারিনা' শীর্ষক আয়াত এবং সংশ্লিষ্ট বুখারী শরীফের হাদীসের মধ্যে যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। ফলতঃ সূরা সাফে এবং সূরা জুমায় বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে আখেরী যুগে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রূপকভাবে দ্বিতীয় আগমন ঘটেছে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে যাঁর নাম মির্যা গোলাম আহমদ (সংক্ষেপে 'আহমদ')। তিনি বলেছেন ঃ "এই আগমনকারীর নাম যে 'আহমদ' রাখা হয়েছে উহাও তাঁর মসীল (অনুরূপ বা বুরুজ) হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করছে। কারণ 'মুহাম্মদ' জালালী (শক্তি ও প্রভাব প্রকাশক) নাম এবং 'আহমদ' জামালী (সৌন্দর্য প্রকাশক) নাম। 'আহমদ' ও ঈসা জামালী অর্থের দিক দিয়ে একই। এই বিষয়েই প্রতি ইশারা রয়েছে, "ওয়া মুবাশশেরাম বে-রুসলি ইয়াতি মিম বাদিস ইসমুহু আহমদ"—এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে।" (ইজালায়ে আওহাম, পৃঃ ৬৭৩)।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের মর্মার্থ অনুযায়ী 'বুরুজ' (রূপক), 'মসীল' (অনুরূপ বা সদৃশ), 'যিল' (প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছায়া) হিসেবে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমন সম্মর্কিত বিষয়টির মধ্যে কিছু সূক্ষ্মতা রয়েছে যা ভালভাবে হৃদয়ংগম করা প্রয়োজন। অবশ্য এরূপ সূক্ষ্মতা সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই কম-বেশী রয়েছে যার মর্মার্থ ব্যাখ্যা এবং বাস্তব দৃষ্টান্ত দ্বারা হৃদয়ংগম করতে হয়। উচ্চ পর্যায়ে আধ্যাত্মিক আলোচনার ক্ষেত্রেও এরূপ গূঢ় অর্থবোধক রূপক বিষয়াদি থাকা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তাই হযরত মুজাদ্দিদ আলেফসানী আহমদ সরহেন্দী (রহঃ) বলেছেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ইন্তেকালের এক হাজার এবং কয়েক বছর পর এমন এক যুগ আসছে যখন 'হকিকতে মুহাম্মদী'-এর নাম 'হকিকতে আহমদী' হয়ে যাবে। (মকতুবাতে ইমাম রাব্বানী, ১ম খন্ড, মকতুব-২০৯)।

সার্বিক দৃষ্টিকোন থেকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর ধর্মের পূর্ণতা এবং আল্লাহর অনুগ্রহের পূর্ণ বিকাশের দৃষ্টি প্রধান পর্যায়ে রয়েছে : (১) ধর্মের বিধি ব্যবস্থা-মূলক পূর্ণতা (তকমীলে হেদায়েত) এবং (২) ধর্মের প্রচার-মূলক পূর্ণতা (তকমীলে এশায়েত)। প্রথম বিষয়টি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রথম আগমনের মাধ্যমে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় অংশটি বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে বর্তমান যুগে এসে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বুরুজী রংগে (রূপকভাবে) দ্বিতীয় আগমনের মাধ্যমে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দ্বারা সম্পূর্ণ হওয়া অবধারিত ছিল (সুরা জুমা : ৪)। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুহাম্মদী উম্মত হতে যথাসময়ে তিনি আগমন করে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচারমূলক কার্যাবলী এমনভাবে সুসংগঠিত করেছেন যা কালক্রমে বিশ্ব-ব্যাপী মহা-বিজয় ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সুমহান লক্ষ্যে অগ্রসর হয়ে চলেছে। সত্যের পূর্ণ প্রচারের সুবিধার্থে আল্লাহতায়ালার বিশেষ অনুগ্রহে বর্ত-যুগে প্রয়োজনীয় বাহ্যিক উপকরণসমূহ—যেমন মুদ্রণ-শিল্প, উন্নত যানবাহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা, দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গণমাধ্যম সমূহের ব্যাপক প্রসার ইত্যাদি-তাঁর আগমনের সময় হতে অর্থাৎ খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে সর্বাধিক পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে। এই সকল বাহ্যিক উপকরণ ও আবিষ্কার গুলির পশ্চাতে একটি মহান ঐশী পরিকল্পনা রয়েছে এবং তা প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আঃ)-এর উপর আপিত মহান প্রচার-মূলক দায়িত্বাবলী সুষ্ঠভাবে সমাধা করার জন্যই পরিচালিত হচ্ছে। সেই সময় অতি সন্নিকটে যখন পৃথিবী সম্যকভাবে বুঝতে পারবে যে, শুধু পার্থিব প্রয়োজন অথবা দৈহিক ভোগ-বিলাসের জন্যই এই সকল আবিষ্কারের দ্বারা বর্তমান যুগকে আশীষ-মণ্ডিত করা হয় নাই—বরং ঐ গুলির পশ্চাতে মূলতঃ সক্রিয় রয়েছে ইসলামের পূর্ণ প্রচারমূলক এক মহান আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য।

(খ) আল্লাহতায়ালা সুরা ফতেহ : ৩৩ আয়াতে বলেছেন "মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহে ওয়াল্লাযীনা মায়াহু আশেদ্দায়ু আলাল কুফফারে রুহামায়ু বাইনাহুম তারাহুম রুক্কায়ান সুজ্জাদাঁই ইয়াবতাগুনা ফাজলাম মিনাল্লাহে ওয়া রিজওয়ানা। সিমাহুম ফি উযুহেহিম মিন আছারিছ ছুজুদ। যালেকা মাছালুহুম ফিত তৌরাতে। ওয়া মাছালুহুম ফিল ইঞ্জিল। কাজারযেন আখারাজা শাতয়াহু ফাযা আজারাহুম ফাছতাগলাজা ফাসতাওয়া আলা সুকেহি ইউজেবুজ জুর-রায়া লেইয়াগিজা বেহেমুল কুফফার। ওয়াদাল্লাহুল লাহীনা আমানু ওয়া আমেলুস সালেহাতে মিনহুম মাগফেরাতাও ওয়া আজরান আযীমা।"

অর্থ : "মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল এবং যাহারা তাঁহার সংগী তাঁহারা অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে কোমল। তুমি তাহাদিগকে আল্লাহর করুনা এবং সন্তুষ্টি লাভের জন্য রুকু ও সিজদারত দেখ, সিজদার চিহ্ন হিসাবে তাহাদের মুখমণ্ডলে দাগ পড়ে। তৌরাতে তাহাদের (প্রথম যুগের অনুসারীদের) বর্ণনা (মেছাল) এরূপই। এবং তাহাদের (ইসলামের পূর্ণজাগরণ মূলক দ্বিতীয় যুগের অনুসারীদের) বর্ণনা (মেছাল) একটি বীজের ন্যায় যাহা

হইতে কচি চারা নির্গত হয়, সেই চারা শক্ত ও মোটা তাজা হয় এবং দৃঢ়ভাবে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায়, যাহা (বপনকারী) কৃষকদিগকে আনন্দ দান করে, যাহাতে তিনি (আল্লাহ্‌) অবিশ্বাসীদের হৃদয়ে উহাদের উৎকর্ষতা দেখার ফলে অন্তর্জ্বালার সৃষ্টি করিয়া দেন। বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহ্‌ মাগফেরাত ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন।"

উপরোক্ত আয়াতে ইসলামের উন্নতির দুইটি প্রধান পর্যায়ের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের বর্ণনা সম্পর্কে তৌরাত ও দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্ণনা সম্পর্কে ইঞ্জিলের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনায় উলেখ করা হয়েছে। প্রথমোক্ত বিষয়ে তৌরাতের ভবিষ্যদ্বাণীঃ "তিনি পরান পর্বত হইতে সমুজ্জল রূপে আবির্ভূত হইলেন এবং দশ সহস্র সাধু সমভিব্যাহারে আগমন করিলেন।" (ডিউটার-নমি, ৩৩ঃ২)। দ্বিতীয় বর্ণনা সম্পর্কে ইঞ্জিলের ভবিষ্যদ্বাণীঃ "দেখ, একজন বপনকারী কৃষক বপন করিতে গেলেন এবং যখন তিনি বীজগুলি বপন করিলেন তখন কতগুলি উত্তম জমিতে পতিত হইল এবং ফল দান করিল—কিছু শতগুণ, কিছু ষাটগুণ এবং কিছু ত্রিশগুণ।" (মথি, ১২ঃ ৩-৮)।

পবিত্র কুরআন ও তৌরাতের উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী ইসলামের প্রথম যুগে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আরবের পারান পার্বত্য এলাকায় আবির্ভূত হয়েছেন, দশ সহস্র সাহাবীসহ, মক্কা বিজয় করেছেন এবং স্বল্পকালের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা ও সভ্যতায় কালজয়ী বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। ইসলামের এই মহা-অভ্যুত্থান ছিল তাঁর 'জালালী' (শক্তি ও প্রতাপ সম্পর্কিত) বিকাশের মহা-পরিচায়ক। অন্যদিকে পবিত্র কুরআন ও ইঞ্জিলের বর্ণনা অনুযায়ী ইসলামের প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় অভ্যুত্থান-যুগে তাঁর 'জামালী' (সৌন্দর্য ও গুণগত বৈশিষ্ট্য) বিকাশের প্রতিফলন ওয়া অবধারিত ছিল। উল্লেখ্য যে, ইসলামের উন্নতির উভয় পর্যায়ে জালালী ও জামালী উভয় প্রকার বিকাশ সংঘটিত হয়েছে—শুধু অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রথম যুগ জালালী বিকাশ এবং দ্বিতীয় যুগে জামালী বিকাশের আধিক্যের বিষয়টিই লক্ষ্যনীয়। প্রথম যুগে আত্মরক্ষার্থে বিরুদ্ধবাদীদের সংগে যুদ্ধ করা অপরিহার্য হওয়ায় জালালী বিকাশের প্রয়োজন হয়েছিল। এই অবস্থার সংগে হযরত মুসা (আঃ)-এর অবস্থার তুলনা করা যায় (সূরা মুজাম্মিল ঃ ১৬) যাঁর আবির্ভাবের মধ্যে জালালী বিকাশ ছিল। কালক্রমে ইহুদীদের অধঃপতনের যুগে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমন ঘটেছিল জামালী রংগে তৌরাতের প্রচার পূর্ণ করার লক্ষ্যে। অনুরূপভাবে মুহাম্মদী উম্মতের অধঃপতন, বিভেদ-বিশৃংখলা ও আত্মকলহের যুগে প্রতিশ্রুত উদ্ধারকারী এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারকারী রূপে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর আগমনও জামালী রংগে হওয়া অবধারিত ছিল। বাস্তবক্ষেত্রে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী হওয়ার দাবী এবং তাঁর অনুসৃত কর্ম-পদ্ধতি জামালী বিকাশেরই পরিচায়ক। এই কারণে বোখারীসহ অন্যান্য হাদীসে তাঁর অন্যতম প্রধান কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি যুদ্ধ রহিত করবেন (ইয়াজ হারুল হারব)। বনী ইস্রায়েলী নবী হযরত ঈসা (আঃ)-কে নগণ্য অবস্থা হতে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ও প্রচারমূলক কাজ শুরু করতে হয়েছিল, এবং রূহ নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছিল, যার ফলে কালক্রমে খৃষ্টধর্মের ব্যাপক প্রচার সম্ভব হয়েছিল। মুহাম্মদী মসীহ তথা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কেও নগণ্য অবস্থা হতে প্রচার কার্য

শুরু করতে হয়েছে, বিরুদ্ধবাদীদের দন্তপেষণ সহ্য করতে হয়েছে (এবং এখন হচ্ছে) এবং কালক্রমে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংগঠন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্যাভিমুখে এগিয়ে চলছে।

উল্লেখ্য যে, যেহেতু এই মসীহ ও মাহদী (আঃ) আগমন করেছেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্য হতে, সেইজন্য খৃষ্টধর্মের ন্যায় ত্রিত্ববাদিতা-মূলক বিকৃতি এবং প্রক্ষেপণ হতে তাঁর সত্য প্রচার কার্য নিরাপদ থাকবে।

(গ) হাদীসের বর্ণনা হতেও ইসলামের উন্নতির দু'টি প্রধান যুগ সম্বন্ধে জানা যায়। হযরত রসুল করীম (সঃ) বলেছেন ঃ—

o "কেমন করিয়া ধ্বংস হবে আমার উম্মত যাহার প্রথম দিকে আমি রয়েছি এবং শেষ দিকে রয়েছেন মসীহ?" (মেশকাত ও জামেউস সগীর)।

o "মাসালু উম্মাতী মাসালুল মাতারে লা ইউদরা আউওয়ালুহু, খায়রুন আম্‌আখেরুহু,"

অর্থ ঃ "আমার উম্মতের অবস্থা বৃষ্টি-ধারার মত। এ সম্বন্ধে বলা যায় না ইহার প্রথম ভাগ উত্তম অথবা উহার শেষ ভাগ উত্তম।" (তিরমিযি)

o "ইউহ্‌লেকুল্লাহু ফি যামানেহীল মিলালা কুল্লাহা ইল্লাল ইসলামা।"

অর্থ ঃ "তাহার (হযরত ঈসার) যুগে আল্লাহতায়ালা ইসলাম ভিন্ন সকল ধর্ম নির্মূল করিয়া দিবেন। (আবু দাউদ)।

o "তাঁহার (হযরত ঈসার) আবির্ভাবের ফলে কানায় কানায় পানি-ভরা পাত্রের ন্যায় পৃথিবী মুসলমানদের দ্বারা পূর্ণ হবে এবং তখন সমগ্র পৃথিবীতে একই কালেমা হবে এবং এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করা হবে না।" (আবু দাউদ)।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেছেন যে, ইসলাম পূর্ণতম ধর্ম (সূরা মায়েদা ঃ ৪) এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আবির্ভূত হয়েছেন বিশ্ব-নবী হিসাবে বিশ্ব-মানবের পথ-প্রদর্শন ও কল্যাণের জন্য (সূরা আরাফ ঃ ১৫৯, আম্বিয়া ঃ ১০৮, সূরা তওবা ঃ ৩৩)। এই ঐশী ঘোষণা অবশ্য অবশ্যই সত্য। বাস্তবক্ষেত্রে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ কথা অনস্বীকার্য যে একদিকে সংখ্যাগতভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এখনও অমুসলিম এবং অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ-ভাবে মুসলমানগণ কলহ-কোন্দল ও বিভেদ-বিশৃংখলার মধ্যে নানা কারণে শতধা-বিভক্ত। ফলতঃ উপরোক্ত ঐশী ঘোষণা এবং বর্তমানের বাস্তব পরিস্থিতিতে দু'টি প্রশ্ন উৎথাপিত হওয়া স্বভাবিক—(১) কিভাবে সমগ্র মানবমণ্ডলীর কাছে বিশ্ব-ধর্ম ইসলামের প্রচার সুসম্পন্ন করা যেতে পারে যার মাধ্যমে পৃথিবীর সকল মানুষ ইসলামের পতাকা তলে একত্রিত হয়ে একটি অখণ্ড মানব-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং (২) কিভাবে শতধা-বিচ্ছিন্ন মুসলিম জন-গোষ্টির মধ্যে প্রকৃত ইসলামী ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে এই দু'টি প্রশ্নের সঠিক এবং বাস্তব-ভিত্তিক সমাধান সম্পর্কে উপরে ইসলামের উন্নতি ও প্রাধান্য লাভের দু'টি প্রতিশ্রুত মহা-পর্যায়-বিশিষ্ট যুগের উল্লেখ করা হলো। বর্তমানকালে আমরা ইসলামের প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় মহা-যুগের এক ক্রান্তিলগ্নে এসে পৌঁছেছি। ফলতঃ ঐশী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও প্রতিশ্রুতির পূর্ণতার মধ্যে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নেই। প্রতিশ্রুত পুনঃজাগরণের জন্য প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামাত বিশ্বব্যাপী ইসলামী শিক্ষা ও সৌন্দর্যকে পূর্ণরূপে প্রচারের জন্য সুসংগঠিত পদ্ধতির মাধ্যমে ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের আলোকে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। (ক্রমশঃ)

—মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

সংবাদ ঃ

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে সরিষাবাড়ী উপজেলা পাবলিক হলে "বিভিন্ন ধর্মে আখেরী যমানা (কলিযুগ) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী" শীর্ষক সেমিনার এবং স্থানীয় কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

গত ১লা মে, ১৯৮৬ ইং রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০-৩০-মিঃ-এ আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে সরিষাবাড়ী উপজেলা পাবলিক হলে বাংলাদেশ মঃ খোঃ আ-র ইসলাহ-ও-ইরশাদ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় "বিভিন্ন ধর্মে আখেরী যমানা (কলিযুগ) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী" শীর্ষক এক সেমিনার এবং স্থানীয় কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অত্যন্ত সাফল্যজনক ভাবে সুসম্পন্ন হয়। আলহামদুলিল্লাহ !

উক্ত অনুষ্ঠানে ঢাকা থেকে মোহতরম মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মোঃ ফারুক আহমদ সাহেব সদর মুরুব্বী সাহেবান ও জনাব মোস্তফা আলী সাহেব সহ মোট ৮ জন এবং ময়মনসিংহ থেকে মোহতরম আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব ও অধ্যাপক আমীর হোসেন সাহেব সহ মোট ৪জন এবং চাঁনতারা, হুসনাবাদ, বকশীগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও জামালপুর থেকে ৪০ জন আহমদী ভ্রাতা যোগদান করেন। স্থানীয় নন-আহমদী সহ সেমিনারে যোগদানকারীদের সংখ্যা ছিল ২৫০ জনেরও বেশী।

উক্ত সভায় সভাপতি ছিলেন সরিষাবাড়ী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আলিমুদ্দিন মন্ডল সাহেব, প্রধান অতিথি—স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মৌলানা নুরুল ইসলাম সাহেব এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। প্রথমেই পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মোঃ ফারুক আহমদ সাহেব, সদর মুরুব্বী, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া। অতঃপর দোওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। দোওয়া পরিচালনা করেন সদর মুরুব্বী মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। তারপর "বিভিন্ন ধর্মে আখেরী যমানা (কলিযুগ) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী"-এর উপর অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও গবেষণামূলক বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। তিনি বিভিন্ন ধর্মে সমন্বয় সাধন এবং কোরআন, হাদীস ও অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থের আলোকে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব ও তাঁর সত্যতার উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী বিশদভাবে পেশ করেন এবং ইহাও প্রমাণ করেন যে, ইমাম মাহদী (আঃ) হিন্দুদের জন্যও প্রতিশ্রুত কল্কি অবতার।

অতঃপর প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রোতামন্ডলী ৩৮টি প্রশ্ন লিখিত আকারে পেশ করেন। সময়ের স্বল্পতার জন্য সভাপতির নির্দেশক্রমে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে মাত্র তিনটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মোহতরম আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব এবং মোহতরম মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী। উভয় বক্তাই অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা

অত্যন্ত সুন্দরভাবে উত্তর প্রদান করেন। বাকী প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। প্রশ্নোত্তর পর্বের শুরুতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) কর্তৃক রচিত 'শানে মুহাম্মদ (সাঃ)' শীর্ষক উর্দু নযম অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে পাঠ করেন চাঁনতারা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ জনাব ইব্রাহীম হোসেন।

অতঃপর পুরস্কার বিতরণী পর্ব শুরু হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান মওলানা নুরুল ইসলাম সাহেব। পুরস্কার বিতরণের পূর্বে কৃতি ছাত্র-ছাত্রী-দের উদ্দেশ্যে বিদ্যাশিক্ষার গুরুত্বের উপর জ্ঞানগর্ভ ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন জনাব মোস্তফা আলী সাহেব। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জ্ঞানলাভের স্পৃহা জাগ্রত করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।

স্থানীয় ২টি উচ্চ বালক বিদ্যালয়, ২টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের, মোট ২২জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। স্থানীয় আরামনগর আলিয়া মাদ্রাসার কৃতী ছাত্রদের তালিকা না পাওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে পুরস্কার দেওয়া সম্ভব হয় নাই ; তবে অনুষ্ঠানে ঘোষণা দান করা হয় যে, তাদের জন্য নির্ধারিত পুরস্কার স্থানীয় আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসি-ডেন্ট সাহেবের নিকট সংরক্ষিত আছে। এবং কৃতী ছাত্রদের তালিকা পাওয়া গেলেই তাহা বিতরণ করা হবে।

বাঃ মঃ খোঃ আঃ নাযেম ইসলাহ ও ইরশাদ জনাব তাসাদ্দক হোসেন ও বিশিষ্ট ভ্রাতা মীর মুহাম্মদ আলী সাহেব ব্যক্তিগতভাবে দ্বীনি অনুপ্রেরণায় এই সকল পুরস্কার প্রদান করেন। আল্লাহতায়ালা তাদের কোরবানী কবুল করুন ও উত্তম জাযা দিন। আমীন!

পুরস্কার বিতরণের পর প্রধান অতিথির ভাষণে উপজেলা চেয়ারম্যান মওলানা নুরুল ইসলাম সাহেব বলেন, দজ্জাল সম্বন্ধীয় হাদিসগুলিকে হয় জয়ীফ বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, নয় ছহী বলে গ্রহণ করতে হবে। হাদীসের বর্ণনায় রূপকের ব্যবহার আছে কিন্তু মৌঃ নুরুল ইসলাম সাহেব বলেন, হাদীসের কোন রূপক অর্থ করা চলবে না। তিনি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ ও শিক্ষাক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানের প্রশংসা করেন। সবশেষে তিনি ঢাকা থেকে যোগদানকারী সম্মানিত বিজ্ঞ অতিথি ও দূরদূরান্ত থেকে আগত অন্যান্য মেহমানদের পূর্ণ নিরাপত্তা ও তাঁদের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ প্রদানের জন্য স্থানীয় জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

অতঃপর সমাপ্তি ভাষণ দান করেন উক্ত সভার সভাপতি সরিষাবাড়ী কলেজের অধ্যক্ষ আলিমুদ্দীন মণ্ডল সাহেব। তিনি বলেন যে, যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ ব্যতীত ধর্মকে বুঝা সম্ভব নয়। তাই ইসলাম ব্যাপকভাবে জ্ঞানাহরণের বিষয়ে জোর দিয়েছে। তাছাড়া প্রকৃত সত্যে পৌঁছা যায় না। তিনি এই সেমিনারের বিষয়বস্তু এবং এই সম্বন্ধে আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের জ্ঞানগর্ভ ভাষণ ও উপস্থাপিত অন্যান্য বক্তব্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সেমিনারটিকে অত্যন্ত উন্নত ধরনের বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই ধরনের সেমিনার এখানে সম্পূর্ণ একটি নূতন অভিজ্ঞতা। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের পর উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীকে আপ্যায়িত করা হয় এবং আপ্যায়নের সাথে সাথে সকলের মধ্যে জামাতের বিভিন্ন বই-পুস্তক ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। সবাই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পুস্তক গ্রহণ করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ৬০০ বই শেষ হয়ে যায়। বাকীদের পরবর্তীতে পুস্তক প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন অধ্যাপক আমীর হোসেন সাহেব।

উল্লেখ্য যে, উক্ত সেমিনার আয়োজনের জন্য বাঃ মঃ খোঃ আঃ-র নায়েম ইসলাহ ও ইরশাদ জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, হুসনাবাদের জনাব প্রফেসার আবদুল জব্বার সাহেব এবং সরিষাবাড়ী মজলিসের নবদীক্ষিত আহমদী জনাব আবদুস সালাম সাহেব, স্থানীয় মজলিসের কায়েদ সাইফুল ইসলাম, বক্‌সিগঞ্জের নুরাদুজ্জামান, চাঁনতারা মজলিসের ইব্রাহীম হোসেন ও এমদাদ অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। এ ছাড়াও দূরদূরান্তর হতে সেমিনারে যোগদানকারী সকল মেহমান এবং যারা আর্থিক ও শারিরীক পরিশ্রম দ্বারা এই সংতি অনুষ্ঠানটিকে সাফল্য মণ্ডিত করার কাজে সহায়তা দান করেছেন তাদের সকলকে আল্লাহতা'লা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

('আহমদী' রিপোর্ট)

কিশোরগঞ্জে খোদ্দামুল আহমদীয়ার নূতন মজলিস প্রতিষ্ঠা

অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে মহান আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে গত এপ্রিল '৮৬ মাসে কিশোরগঞ্জ খোদ্দামুল আহমদীয়ার নতুন মজলিস কায়েম হয়েছে।

৬ জন খোদ্দাম নিয়ে গঠিত এই নব গঠিত মজলিসের মোহাম্মদ তোজাম্মেল হোসেনকে মোহতারম ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব কায়েদ হিসাবে অনুমোদন দান করেছেন। অনুমোদনপ্রাপ্ত আমেলার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হচ্ছেন—(১) কে, এস, তাহমিদুল হাসান—মোতামাদ ও নায়েমে মাল, (২) ইউসুফ আহমদ—নায়েম তালীম তরবিয়ত ও ইসলাহ-ইরশাদ (৩) মোজাফফর আহমদ—নায়েমে তজনীদ ও খেদমতে খালক। নবগঠিত এই মজলিসের সার্বিক কামিয়াবীর জন্য জামাতের সকল বন্ধুর নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

'ইসলামী নীতি দর্শন' পুস্তকের উপর আলোচনা সভা

মহান আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে গত ৩০/৪/৮৬ ইং তারিখ বাদ মাগরিব ময়মনসিংহ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে জনাব আমীর হোসেন সাহেবের বাসায় "ইসলামী নীতি দর্শন' পুস্তকের উপর একটি আলোচনা সভা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। আল-হামদুলিল্লাহ। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনাব জাফিউদ্দিন আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব এস, এম. কবীর। অতঃপর খদ্দঃ মোহাম্মদ মাহবুব-উল ইসলাম, অধ্যাপক জনাব আমীর হোসেন সাহেব এই অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকটির ঐতিহাসিক পটভূমী সহ বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধ সুন্দরভাবে আলোকপাত করেন। অধ্যাপক জনাব আমীর হোসেন সাহেব হৃদয়গ্রাহী আলোচনার দ্বারা মানব জীবনের উপর পুস্তকটির সুদূর প্রসারী অবদানের কথা উল্লেখ করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণে জনাব জফি উদ্দিন আহমদ সাহেব অত্যন্ত সুন্দরভাবে পুস্তকটি সম্বন্ধ জ্ঞান-গর্ভ আলোচনা করেন এবং উপস্থিত খোদ্দামবৃন্দকে পুস্তকটি ভালভাবে পাঠ করার জন্য আহ্বান জানান। আলোচনা সভায় বেশ কিছু অ-আহমদী জ্ঞানী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভাশেষে উপস্থিত সবাইকে অধ্যাপক জনাব আমীর হোসেন সাহেব উত্তম ভাবে চা-নাস্তায় আপ্যায়িত করেন।

—খাকসার

খদ্দঃ মোহাম্মদ মাহবুবউল-ইসলাম, জেলা কায়েদ ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর

দোওয়ার আবেদন

আগামী ১৯শে জুন '৮৬ইং এবারের H.S.C পরিক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত পরীক্ষায় খাকসার এবং অন্যান্য সকল যোগদানকারীদের পূর্ণ কামিয়াবী ও সাফল্যের জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। —ফারুক আহমদ (বি, বাড়ীয়া)

সিলসিলার বুজুর্গানদের স্মরণে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩)

পূর্ব-বঙ্গে জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব (রাহঃ) যদিও আরবী-ফার্সি-উর্দুতে ছিলেন বে-বাহা এল্‌মের দরিয়া, কিন্তু তিনি ছিলেন বাংলা লেখনিতে ব-কলম! যাহা হউক, এই এলাহি সিলসিলার কার্য নির্বাহের অন্তরায়ে লেখনি চালনার অভাব বেশী দিন দাঁড়াতে পারে নাই। আল্লাহতায়ালার অসীম কুদরতে এক নবদীক্ষিত কলম—সোলতান মুনসী ছাবের আলী চৌধুরী মৌলানা সাহেবের সমীপে এসে নিজেকে সিলসিলার লেখনি-সংগ্রামে সমর্পন করিলেন। ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়ার পার্শ্ব-বর্তি শহর-তলি মৌল্লাইল-বাসিন্দা মীর সৈয়দ আবদুল হাজ্জাক, মীর সৈয়দ আবদুস সাত্তার, মোল্লা সাধুর বাপ প্রমুখ বিশিষ্ট আহমদীদের মধ্যে মুনসী ছাবের আলী চৌধুরী ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া কোর্টে চাকুরীজীবি 'নাজির' এবং অত্র এলাকায় যৎসামান্য লেখক। আহা, আহমদী সিলসিলায় কলম-ধারণ করে তিনি অল্প কালের মধ্যেই উচ্চ শ্রেণীর লেখক হিসাবে পরিগণিত হন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া আহমদীয়া আন্দোলনের মুখ দর্পন স্বরূপ সর্বপ্রথম সাহিত্য পুস্তক "জ্ঞানাঞ্জন" মুনসী ছাবের আলী চৌধুরীর অমর কীর্তি! অবশ্য এই জ্ঞান-গর্ভ 'জ্ঞানাঞ্জন' প্রকৃতপক্ষে মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদেরই (রহঃ) পাক-যবান নিঃসৃত পুথির ভাষায় অনুদান।

কিছু কাল পরে হযরত খলিফাতুল মসিহ সানীর (রাঃ) খাহেস অনুসারে মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ (রাহঃ) "আল-বুশরা" শীর্ষক ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ক্রমে ঐ পত্রিকার চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়ে পত্রিকাটি কোন কারণে বন্ধ হয়ে যায়। সিল-সিলার আকায়েদ সম্বন্ধীয় অতি উচ্চ শ্রেণীর প্রবন্ধাবলী ঐ মুখপত্রে বের হতে থাকে। "ধর্ম্ম-সমন্বয়" "আহমদ-চরিত" হযরত ডাঃ মুফতি সাহেবের রম্য উপাখ্যান" প্রভৃতি প্রবন্ধ সমুহ তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজ, হিন্দু ধর্ম্ম-সাহিত্য-লেখক বর্গের দৃষ্টিতে সমাদৃত হয়। জামাতের লেখকগণের মধ্যে অবশ্য ছাবের আলী চৌধুরীই ছিলেন পরিচালক। 'কবিতা' 'লিখক মৌলবী আউসাক আলী উকিল, সাহিত্য রচনায় মৌলবী হুসাম-উদ্দিন হায়দার, ধর্ম্ম সমালোচনায় মৌলবী আবদুস সোবহান (গাইবান্ধা) এবং গাইড লাইন নির্ণয়ে খান বাহাদুর আবুল হাসেম খান চৌধুরী ও খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব লিখক বর্গকে অতি মজবুত ভিত্তিতে সম্বলিত ও প্রতিষ্ঠিত রাখেন। খান বাহাদুর আবুল হাসেম খান চৌধুরী ইংরেজীতে 'বুলেটিন'ও প্রকাশ করিতে থাকেন। সেই উজ্জল যমানার পাঠক শ্রেণীর অবশিষ্ট দুই মহা বুজুর্গ আজিও বেঁচে আছেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহাদের হায়াত দারাজ করুন। আমীন।

হায়, ছাবের আলী চৌধুরীর মৃত্যুর সাথে সাথে কি তাঁহার স্মৃতিও নিমজ্জিত হল? না, না, তাহা নয়—! তাঁহার অনুদিত—"আল-হামদুলিল্লাহ"—তাঁহার স্মৃতি চিরজাগ্রত রাখিবে।

"সম্যক প্রশংসা তব প্রভু আলমের/রহমান রহিম তুমি মালিক দ্বীনের/তোমাকেই পুজি, চাই মদদ তোমার/দেখাও সরল পথ ঐ সবাকার"—ইত্যাদি.....

—চৌধুরী আবদুল মতিন

বেলাল যুগে যুগে

—মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

অন্ধকার জাহেলী যুগে হিংসা হানাহানি আর
রক্ত পিপাসায় উন্মত্ত মানুষ পশুর অধম,
সত্য ন্যায় ও মানবতা পদদলিত নিষ্ঠুর অহমিকায় ;
হাবসি কৃতদাস এক জীবনের মূল্য যার প্রভুর করুণা

বলির পশুর চেয়েও তুচ্ছ নগন্য অতি।
তুমি সেই বেলাল মহানবীর অতি আদরের ধন
তৌহিদ-প্রেম আর রসুল-প্রেমের অনন্য উপমা,
হাবিবে-খোদার পবিত্র হাতে রেখে হাত হলে ইতিহাস !
রক্তাক্ত দেহ নরপশুদের পাশবিক নির্যাতনে ক্ষতবিক্ষত

মুখে 'কলেমা তৌহিদ' আর অন্তরে খোদা ও রসুল-প্রেম
স্বর্গীয় অমৃত মদিরা পানে প্রশান্তিতে ভরা বুক !
ছিলে না তুমি আত্ম-অহংকারী সমাজপতি আবু জাহেল
কিংবা সেই আবু লাহাব অন্ধ অহমিকায় গর্বিত বুক,

অতি নগন্য কৃতদাস থেকে হলে সৈয়্যদনা বেলাল (রাঃ)
নবীকুল শিরোমণি হাবিবে-খোদা প্রদত্ত অনন্য খেতাব,
জগতের লক্ষ কোটি মোমেনের আদর্শ গর্বের ধন
ইসলামের প্রথম মোয়াজ্জিন শান্তির বাণী ছড়ালে চারিদিকে।
তোমার কালজয়ী মহান আত্মত্যাগ অনুসরণ করে

এযুগে শত সহস্র বেলাল সত্য ও ন্যায়ের পতাকা হাতে,
নব-জাহেলিয়াতের নির্মমতার অগ্নীকুণ্ডে দন্ডায়মান,
মাহ্‌দীর পবিত্র হাতে হাত রেখে তাঁরাও দেওয়ানা আজ

রসুল-প্রেম আর তৌহিদ প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত !
চারিদিকে পারষ্পারিক উল্লাসে মত্ত জাহেলের দল
এক আবু জাহেল আর আবু লাহাব নয় শুধু, আজ

সমগ্র রাষ্ট্র শক্তি নির্যাতনের অভিনব অস্ত্র নিয়েছে হাতে,
তবু পারেনি কেড়ে নিতে মুখের সেই স্বর্গীয় হাসি
ফাঁসির রজ্জু যেন বরমাল্য, মুখে মিলনের গান—কলেমা তৌহিদ !
তুমি কি অপেক্ষায় আছ তাঁদের জন্য হে বেলাল !
তোমার আদর্শের ইতিহাসে যাঁরা—দেখাল জীবন্ত করে ?

ইসলামের দ্বিতীয় বিজয়ের রবি রঞ্জিত হল যাদের রক্তে
তাঁরা অন্য কেহ নয়, তোমারইপ ুনরাগমন 'আখেরীণ' সাজে,
বিশ্ব-নবীর গোলামের গোলাম—ইতিহাসের সেই ইসমাইল যেন
কুরবানীর তীক্ষ্ণ ছুরি গলে, ইসলামের বিশ্ব-বিজয় একমাত্র চাওয়া /

—০—

আহ্‌মদীদের বিয়ে-শাদী

—চৌধুরী আবদুল মতিন

আহ্‌মদীর মেয়ে জামাতের মেয়ে, মা-বাপের হেফাযতে, হুঁসিয়ার!
"তালিম তরবিয়তে" গড়ে কোনও মতে আল্লাহ্‌র রহমতের এন্তেযার!
আহ্‌মদীর ছেলে জামাতেরই ছেলে, বাপ-মায়ের কিসের অভিমান!
লক্ষ মুদ্রা চাই, ছেলের খবর নাই, চলিছে ... ...বে-শরায়ী অভিযান!
মুহূর্তের দুঃলোক, খোত্‌বার আলোকে, পড়ে নিয়েছ কী পরওয়ানা!
"ওয়াত্তাকুল্লাহ্‌"র কঠিন গলাবন্ধন পরে, চলিবেনা কোনও ছলনা!
দশ শর্তের ঐ লৌহ বর্ম্ম হের, চলিতে হইবে সুদূর পথে—
মাহ্‌দীর (আঃ) ইঙ্গিতে, নির্ভয়ে চলা, ইসলামের ঐ বিজয়-রথে।
যত অগ্রসর, তুতই বিজয় লক্ষ্য পথে ধ্রুব তারা।
স্বর্গ-সম্ভার, অফুরন্ত পাবে কোরবানীতেই—সর্বহারা—!
আহ্‌মদীয়াতে জীবন যতই কঠিন—দোওয়ায় করিবে সহজ
ধূম্রবৎ উড়ায়ে বাধা-বিপত্তি,—স্বর্গ-রাজ্য অর্জ্জন ফরজ।
বিজয়-শতাব্দির এ-পারে দাঁড়িয়ে—এখনও কী ইতঃস্ততঃ
আহ্‌মদীর জীবনে তপ্ত মোজেযা,—জঙ্গে বদর বিজয়ীর মত!!

—০—

হে মযলুম বন্ধুগণ!

—ইকবাল (মুন্সিগঞ্জ)

তোমাদের নাম লেখা রবে চিরকাল—
পাথরে খোদাই করা লেখা হয়ে ;
অশ্রু-সিক্ত অক্ষরে!
পারবেনা কেউ বিলোপ করতে—
পাশবিক অপ-প্রচারে।
যারা মযলুম, যারা-নিপীড়িত,
যারা শহীদ, যারা চলে খোদার অভিযারে ;
তাঁদের পানে গচ্ছিত কল্যাণ রয়েছে শুধু চেয়ে।
যারা সত্যের সাধক, সত্যের পথে হয় নাকো বঞ্চিত
তাঁদের তপ্ত শোনিতে রাজপথ সদা হয়ে থাকে রঞ্জিত!
তা-ই বিধাতার বিধান।
আরক্ত প্রত্যুষে মোদের নবীজি রেখে গেছেন কত না কীর্তি...
শত্রুর দাহণে ত্যাগিতে হয়েছে মাতৃভূমির প্রীতি
কখনও প্রকট অত্যাচারে... ... ...।
প্রকট, প্রচ্ছন্ন, উন্মেশ, বিকাশ সর্বদা আছে এ জীবনে।
উদ্‌গ্রীব যারা, উগ্র যারা... ... ...
তাদের থেকে পাবনা মোরা একটুকরো নমের আভা,
তাদের দ্বারা মোদের দহনে—যেটুকু পাই আলোর প্রভা,
তাই দেখে দেখে চল্‌ব মোরা—
বিধাতার অভিযারে!!

—০—

ওয়াক্‌ফে আরজীর জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

তবলীগের কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য ওয়াক্‌ফে আরজীর বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। জামাতের সকল ভ্রাতার দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। বিশেষ করিয়া যাহারা অবসর-প্রাপ্ত অভিজ্ঞ এবং তবলীগের জোশ ও অভিজ্ঞতা রাখেন তাহাদের এব্যাপারে আগাইয়া আসার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

হুজুর (আইঃ) সম্প্রতি ন্যাশনাল আমীর সাহেবকে লিখিত এক পত্রে এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, ওয়াক্‌ফে আরজী কমপক্ষে পনের দিনের জন্য হয় এবং বাংলাদেশের যে কোন জামাতে নিজ খরচে যাওয়া-আসা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শুধু থাকার ব্যবস্থা স্থানীয় জামাত করিবে।

খাকসার—
মাজহারুল হক
সেক্রেটারী, ইসলাহ, এরশাদ, বাঃ আঃ আঃ।

শুভ বিবাহ

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে বিগত ২রা মে ১৯৮৬ইং বাদ জুম্‌য়া, ঢাকা দারুত-তবলীগ মজলিসে,—পল্লবী মীরপুর, ঢাকা নিবাসী আলহাজ্ব চৌধুরী আবদুল মতিন সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা মোসাম্মাৎ তানযিলা সুলতানার সহিত নন্দনপুর, কুমিল্লা নিবাসী ডাঃ আবদুল আজিজ সাহেবের তৃতীয় পুত্র জনাব মোহাম্মদ আবদুল মতিন (এম, কম,)-এর শুভ বিবাহ ২০,০০০/- (বিশ হাজার টাকা) মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান সদর মুরুব্বী মৌঃ আবদুল আজিজ ছাদেক সাহেব। দোওয়ায় মোহতারম আমীর সাহেব সহ ঢাকা জামাতের সকল গন্যমান্য ভ্রাতা ও ভগ্নী এবং মুসল্লীগণ যোগদান করেন।

উক্ত বিবাহ সর্বতঃভাবে বাবরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে খাসভাবে দোওয়ার অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

কৃতী ছাত্রী ও দোওয়ার আবেদন

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জনাব আবদুল ওয়াহেদ খন্দকার সাহেবের পৌত্রী ও জনাব মোহাম্মদ মুসলিম খন্দকার সাহেবের প্রথমা কন্যা সুলতানা ফেরদৌসী ১৯৮৫ সনে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া মিশন প্রাইমারী স্কুল হইতে টেলেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করিয়াছে। তার সামগ্রিক সাফল্য ও দ্বীনি ও রুহানী উন্নতির জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে দোওয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে।

খাকছার—
মোস্তফা আহম্মদ খন্দকার
নায়েব জিলা কায়েদ (২) কুমিল্লা, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) জামাতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছিলেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোজা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) প্রত্যহ কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় প্রত্যহ পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লিহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব্ব্ আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুন্নাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু, ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বে ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব প্রত্যেক জিনিস তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মউওদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য, এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দুমাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃত-পক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, প্রকাশ্যে আমাদের এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?"

"আলা ইন্না লা নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

('আইয়ামুস সুলেহ,' পৃঃ ৮৬-৮৭)।

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya

4 Bakshibazar Road, Dhaka-11. Phone No. 501379

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar